আমার জীবন।

শ্রীমতী রাসসুন্দরী কর্ত্তৃক
লিখিত।

কলিকাতা, ১২১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীসরসীলাল সরকার দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৪৩ নং বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট, 'এলগিন মেশিন' প্রেসে
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—সন ১৩০৫—

B

প্রথম ভাগ "আমার জীবনের"

সূচীপত্র।

ষষ্ঠ রচনা।

সপ্তম রচনা।

অষ্টম রচনা।

নবম রচনা।

দশম রচনা।

একাদশ রচনা।

দ্বাদশ রচনা।

ত্রয়োদশ রচনা।

চতুর্দ্দশ রচনা।

পঞ্চদশ রচনা।

ষোড়শ রচনা।

দ্বিতীয় ভাগ "আমার জীবনের"

সূচীপত্র।

মঙ্গলাচরণ।

বন্দে সরস্বতী মাতা, তুমি বল-বুদ্ধিদাতা,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তব বাধ্য।
সদয় হইয়া মনে, বৈস মম হৃদাসনে,
প্রণমিব পদে যথাসাধ্য॥
অবোধ অবলা কন্যা, নিজগুণে কর ধন্যা,
যাতে মম পূরে অভিলাস॥
এই আশা করি মনে, তব প্রিয়পতি সনে,
আমার কণ্ঠেতে কর বাস॥

প্রথম রচনা।

জীবন-চরিত।

কোথা বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু বিশ্বেশ্বর।
হৃদয়ে বসিয়া মম বাঞ্ছা পূর্ণ কর॥
অজ্ঞান অধম আমি তাহে নারী ছার।
তব গুণ বর্ণিবারে কি শক্তি আমার॥
তবু তব কীর্ত্তন করিতে সাধ মনে।
রাসসুন্দরীকে দয়া কর নিজগুণে॥

লাম, মা ! আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। মা হাসিয়া বলিলেন, গঙ্গা স্নানে যাইবে, কি চাও। আমি বলিলাম, একটা বোচ্‌কা চাই। গঙ্গাস্নানের অর্থ আমি বিশেষ কিছুই জানি না; এই মাত্র জানি, পথে বসিয়া জলপান খায়, আর কাপড়ে একটা বোচ্‌কা বাঁধিয়া মাতায় করিয়া পথে হাঁটিয়া যায়। আমার মা আমার ঐ সকল অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এক খানি কাপড়ে কিছু জলপান, দুটি আম বাঁধিয়া একটি পুটলি করিয়া আমাকে আনিয়া দিলেন। তখন ঐ পুটলি দেখিয়া আমার মনে যে কি পর্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হইল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম, আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এখন তাহার শতগুণ বেশী আহ্লাদের কাজ হইলেও তেমন আহ্লাদ মনে বোধ হয় না। আহা! সে যে কি আহ্লাদের দিন ছিল, তাহা বলা যায় না। তখন আমি ঐ পুটলি লইয়া সেই বালিকার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চলিলাম। পরে এক পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া জলপান খুলিলাম। তখন আমার সঙ্গিনী বালিকা আমাকে বলিল, দেখ, তুমি, যেন আমার মা, আমি যেন তোমার ছেলে। তুমি আমাকে কোলে লইয়া খাওয়াইয়া দাও। তখন আমি বলিলাম, তবে তুমি আমার কোলের কাছে বৈস। তখন সে আমার কোলের কাছে বসিল। আমি বলিলাম, আচ্ছা তবে খাও। এই বলিয়া ঐ সকল জলপান উহাকে খাওয়াইয়া দিলাম। পরে সে বলিল, আঁচাইয়া দাও। তখন আমি ভারী বিপদে পড়িলাম। কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। আমি জলে

নামিয়াও জল আনিতে পারিলাম না। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। আমার সঙ্গিনী ঐ অপরাধে আমাকে একটী চড় মারিল। আমি মার খাইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। আমার দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি অমনি দুই হাত দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমাকে মারিতে কেহ বুঝি দেখিল, এই ভয়ে আমি চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম।

ঐ সময়ে আমার খেলার সঙ্গিনী আর একটি বালিকা সেই স্থানে ছিল। সে উহাকে বলিল, তুমি কেমন মেয়ে! উহার সকল জলপান খাইলে, আম দুটাও খাইলে, আবার উহাকে মারিয়া কাঁদাইতেছ। আমি গিয়া উহার মায়ের কাছে বলিয়া দিই। এই বলিয়া সে আমাদের বাটীতে গিয়া সকলের নিকট বলিয়া পুনর্ব্বার আমাদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি তোমার মায়ের কাছে সকল কথা বলিয়া দিয়াছি। দেখ এখনি, কি করে। ঐ কথা শুনিয়া আমার ভারী ভয় হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার গঙ্গা-স্নানের সঙ্গিনী বালিকা বলিল, উনি একটি সোহাগের আরসী, কিছু না বলিতেই কাঁদিয়া উঠেন। এই বলিয়া আমার মুখে আর একটী ঠোকনা মারিল। তখন আমার অত্যন্ত ভয় হইল, আমি চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমি সোহাগের আরসী হইয়াছি, না জানি, আমার কি হইল? তখন আমার এই ভয়ই হইতে লাগিল, আজি, আমাকে ছেলে ধরা ধরিয়া লইয়া যাইবে, উহাকেও বুঝি লইয়া যাইবে।

এই ভয়ে আমি আমাদের বাটীতে না গিয়া ঐ গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনীর বাটীতেই গেলাম। তখন উহার মা, আমার মুখের দিকে চাহিয়া উহাকে বলিল, উহার মুখ লাল হইয়াছে কেন? তুমি বুঝি উহাকে কাঁদাইয়াছ? এই বলিয়া তাহার মা তাহাকে গালি দিল। সে তাহার মায়ের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। পরে তাহার মা গেলে, সে আমাকে বলিল, দেখ, আমার মা আমাকে গালি দিল, আমি তো তোমার মত কাঁদিলাম না। তুমি যেমন আহ্লাদে মেয়ে হইয়াছ। তুমি বুঝি তোমার মায়ের কাছে গিয়া সকল কথা বলিয়া দিবে। তখন আমি মাতা নাড়িয়া বলিলাম, না, আমি মায়ের কাছে গিয়া কিছুই বলিব না, ইহা বলিয়া আমি বিষণ্ণবদনে সেই স্থানে বসিয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাটী হইতে এক জন লোক আসিয়া আমাকে বাটী লইয়া গেল। আমি বাটী গিয়া দেখিলাম, সকলেই আমার ঐ সকল কথা বলিয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া গঙ্গা-স্নান হয়েছে বলিয়া আরো হাসিতে লাগিল। তখন আমার খুড়া, দাদা এবং অন্যান্য সকলেও বলিতে লাগিলেন, আর এ সকল মেয়েদের সঙ্গে উহাকে খেলিতে দেওয়া হইবে না। কল্য হইতে উহাকে বাহির বাটীতেই রাখা যাইবে। তখন সে এক দিন ছিল, এখানকার মত মেয়ে-ছেলেরা লেখা পড়া শিখিত না। বাঙ্গলা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখা-পড়া করিত। একজন মেম সাহেব ছিলেন, তিনিই সকলকে শিখাইতেন। পর দিবস প্রাতে আমার খুড়া

আমাকে কাল রঙ্গের একটা ঘাগরা পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেম সাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিলেন। আমাকে যেখানে বসাইয়া রাখিতেন, আমি সেই খানেই বসিয়া থাকিতাম। ভয়ে আমি আর কোন দিকে নড়িতাম না। তখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর। তখন আমার শরীরের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সকলে যাহা বলিত, যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি :—

বর্ণটি আছিল মম অত্যন্ত উজ্জ্বল।
উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল॥
সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদগুলি।
বলিত সকলে মোরে সোণার পুতুলী॥

আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতাম না। আমার মুখে পরিষ্কৃত হইয়া কথা বাহির হইত না। যে দুই একটি কথা বাহির হইত, সেও আধ আধ, তাহা শুনিয়া সকলে হাস্য করিত। আমাকে যদি কেহ বড় করিয়া ডাকিত, তাহা হইলেই আমার কান্না উপস্থিত হইত। বড় কথা শুনিলেই, আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। এজন্য আমার সঙ্গে কেহ বড় করিয়া কথা কহিত না; আমি সকল দিবস সেই স্কুলেই থাকিতাম। মেয়ে-ছেলের মত আমাকে বাটীর মধ্যে রাখা হইত না। তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়ই থাকিতাম। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম। সে কালে পারসী পড়ার

প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম। আমি যে ঐ সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি, তাহা আর কেহ জানিত না। আমাকে পরিজনেরা সমস্ত দিন বাহিরে রাখিতেন। কেবল স্নানের সময়ে বাটীর মধ্যে আনিয়া স্নান আহারের পরেই আবার বাহিরে রাখিয়া আসিতেন, আর সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটীর মধ্যে আনিতেন। এই প্রকার সকল দিবস আমি স্কুলে সেই মেম সাহেবের কাছেই বসিয়া থাকিতাম। তখন আমার মনের অবস্থা কি প্রকার ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। ভয়ে যেন আমার মন এককালে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। যদিও মনের কখন একটু অঙ্কুর হইয়া উঠিত, অমনি ভয় আসিয়া চাপা দিয়া রাখিত।

দ্বিতীয় রচনা।

—০—

ধন্য ধন্য প্রভু তুমি ধন্য ত্রিভুবনে।
কত ধন্যবাদ দিব এ এক বদনে॥
ধন্য তব দয়া, ধন্য নিয়ম তোমার।
ধন্য তুমি মায়ারূপে বেপেছ সংসার॥
ধন্য তব অপরূপ সৃষ্টি মনোহারী।
ধন্য তব কৌশলের যাই বলিহারি॥
ধন্য এই চন্দ্র সূর্য্য ধন্য বসুমতী।
ধন্য পশু পক্ষী ধন্য বৃক্ষ বনস্পতি॥
কত মনোহর রূপে পৃথিবী উজ্জ্বল।
তাহে পবনের গতি অতি সুশীতল॥
সুরধুনি-প্রবাহিণী নদী শত শত।
সৌরভ-বাহিনী কত বর্ণিব বা কত॥
রাসসুন্দরীর জন্ম ধন্য করি গণি।
শ্রবণে পরশে তব নামামৃত-ধ্বনি॥

এক দিবস আমার খুড়া বাহির বাটী হইতে আমাকে বাটীর মধ্যে আনিতেছেন, ঐ সময়ে একজন গোবৈদ্য একখানা ছালা ঘাড়ে করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিয়া ছেলে-ধরা ভাবিয়া ভয়ে এককালে মৃতপ্রায় হইলাম। তখন আমার মনে এত ভয় হইয়া-

ছিল যে আমি দুই হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। সেই সময়ে সে স্থানে যত লোক ছিল, তাহারা আমাকে ভয় নাই, ভয় নাই বলিয়া হাসিয়া মহাগোল করিতে লাগিল। আমার খুড়া আমাকে কোলে লইয়া বাটীর মধ্যে গিয়া বলিলেন, আজ ভাল ছেলে-ধরার হাতে পড়িয়াছিলাম; এই বলিয়া তিনি, আর সকলেই, হাসিতে লাগিলেন।

তখন আমার মায়ের কাছে গিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমার এত ভয় কেন? ভয় নাই,- কিসের ভয়, ছেলে-ধরা নাই, ও সকল মিছা কথা, আমাদের দয়ামাধব* আছেন, ভয় কি? তোমার যখন ভয় হইবে, তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও, দয়ামাধবকে ডাকিলে তোমার আর ভয় থাকিবে না। মার ঐ কথাতে আমার মনে অনেক সাহস হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, মা বলিয়াছেন, ছেলে-ধরা নাই, আর আমাদের দয়ামাধবও আছেন এই বলিয়া কিছু স্থির হইলাম। বিশেষ আমি একাও কোন খানে যাইতাম না। আমার সঙ্গে সঙ্গে লোক থাকিত। বাস্তবিক আমার মত ভয় কোন ছেলের দেখা যায় না। এমন কি, বুড়া মানুষ দেখিলেই আমার দাঁত লাগিত, এজন্ত আমাকে একা রাখা হইত না। আমার এক পিসী ছিলেন; তিনি অতি অল্পকালেই বিধবা হন। আমার বুদ্ধির

---

* আমাদের বাটীতে যে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন তাঁহার নাম দয়ামাধব।

অগোচরে তিনি বিধবা হইয়াছেন। এক দিবস আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিসি! তোমার হাতে শঙ্খ এবং গায়ে গহনা নাই কেন? পিসী বলিলেন, আমার বিবাহ হয় নাই। সেই জন্য আমার হাতে শঙ্খ এবং গায় গহনা নাই। পিসীর ঐ কথায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইল। আমি যত বিধবা দেখিতাম আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইত, যে, উহাদের বিবাহই হয় নাই। আমি চারি বৎসরের সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। সে সকল বিষয় আমি কিছুই জানি না। এক দিবস আমি সেই স্কুলে মেম সাহেবের নিকট বসিয়া আছি, ইতিমধ্যে এক জন ভদ্র লোক আমাকে দেখিয়া আমার খুড়াকে বলিলেন :—রায় মহাশয়! আপনি বুঝি মঙ্গল ঘট বসাইয়া সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই বলিয়া খুড়ার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কন্যাটি কাহার? আমার খুড়া বলিলেন, এ কন্যাটি পদ্মলোচন রায়ের। ঐ কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভাবিত হইলাম, আমার মন এককালে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এত দিবস আমি জানিতাম, আমি মায়ের কন্যা। বিশেষ আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমি এই কথা যত ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার মন বিষন্ন হইতে লাগিল। পরে আমি বাটীর মধ্যে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! আমি কাহার কন্যা? মা আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর কিছু বলিলেন না। তখন আমি পিসীর নিকট গিয়া বলিলাম পিসি! আমি কাহার কন্যা? পিসী আমার কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ঐ

কান্না দেখিয়া এককালে অবাক হইলাম। পিসী কি জন্য কাঁদেন, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্না সম্বরণ করিয়া বলিলেন, হা বিধাতঃ! তুমি এমন নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছ? এ অজ্ঞান সন্তান পিতৃস্নেহ কিছুই জানিল না; পিসী এই বলিয়া, আমাকে কোলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি কাহার কন্যা জান না? তুমি পদ্মলোচন রায়ের কন্যা! ঐ কথা শুনিয়া আমি নীরব হইয়া থাকিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে বড় কষ্ট হইতে লাগিল, কি প্রকার দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মন আমার কিছুতেই স্থির হইল না। তখন আমি বলিলাম, পিসি! আমি কেমন করিয়া পদ্মলোচন রায়ের কন্যা হইলাম। তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এমন নির্ব্বোধ মেয়ে কোথা ছিল, কিছুই বুঝে না। শুন বুঝাইয়া দিই, তোমার পিতা তোমার মাতাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই জন্য তুমি তাঁহার কন্যা হইয়াছ।

শুনিয়া আমার অধিক চিন্তা হইতে লাগিল। আমি ভাবিয়া ভাবিয়া পুনর্ব্বার বলিলাম, তিনি তবে কোথা গিয়াছেন? পিসী বলিলেন, মা! ও কথা বলিয়া আর জ্বালাইও না, তিনি মরিয়াছেন। ঐ মরা নাম শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইল। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। আমার কাছে যদি মরা আইসে, তবে আমি সেই দয়ামাধবকেই ডাকিব। এই ভাবিয়া মনকে কতক স্থির করিলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের বাটীর কাছে এক বাটীতে এক দিবস

রাত্রে আগুন লাগিয়াছে, তখন আমরা তিন জন ছোট। আমার দুই বৎসরের বড় এক ভাই, আর আমার দুই বৎসরের ছোট এক ভাই, ইহার মধ্যে আমি। আমাদের বাটীর নিকট একটা মাঠ আছে। সেস্থানে লোকের বসতি নাই, এবং বৃক্ষাদি কিছুই নাই। কেবল ক্রোশ খানেক অন্তরে একটা নদী আছে। তখন আগুন দেখিয়া আমাদের বাটীর নিকটস্থ ঐ মাঠে সকলে জিনিস-পত্র সকল বাহির করিতেছে। সেই স্থানে আমাদের তিন জনকেও রাখা হইয়াছে। সে বাটীতে আগুন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, তথাকার সকল লোক চীৎকার শব্দ করিতেছে। কত লোক কান্না আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের বাঁশ রূয়া, চট পট করিয়া শব্দ করিতেছে, নানা প্রকার গোল হইতেছে। আমরা তিন জনে কাঁদিতেছি। ঐ আগুন যখন আমাদের বাটীতে লাগিয়া এককালে প্রজ্বলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন আমাদের জ্ঞান হইল, যেন আগুনে পুড়িয়া মরিলাম। এই ভাবিয়া তিন জনে কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ মাঠের দিকে চলিলাম। তখন আমরা এক এক বার পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি আগুন জ্বলিতেছে। আমরা আরও দৌড়িয়া যাইতে লাগিলাম। এই প্রকার যাইতে যাইতে সেই নদীর কূলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন আমরা কি পর্য্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম তাহা বলা যায় না। আমরা আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিলাম।

নদীর কূলে যেস্থানে আমরা আছি, সে স্থান সমুদয় শ্মশান। খাট, গদি, বালিস, চাটাই, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে আমরাই

তিন জন ভিন্ন আর লোক নাই। ইতিমধ্যে দাদা বলিলেন, দেখিতেছি, এ সকল শ্মশান, মড়ার বিছানা পড়িয়া আছে। ঐ মড়ার নাম শুনিবা মাত্র আমার অত্যন্ত ভয় হইল। সে ভয় যেন হা করিয়া আমাদের গ্রাস করিতে আইল, এই মত জ্ঞান হইতে লাগিল।

আমরা তিন জনে প্রাণপণে কাঁদিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার মনে হইল, মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে, দয়া-মাধবকে ডাকিও। তখন আমি বলিলাম, দাদা! দয়ামাধবকে ডাক। তখন আমরা তিন জন দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, আর কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমাদের কান্না যে কেহ শুনিবে, সে এমন স্থান নহে। এ দিকে নদী ও দিকে প্রজ্বলিত অগ্নির ভীষণধ্বনিতে কর্ণ বধির হইতে লাগিল; মনুষ্যের কলরব এবং পরস্পরের কান্নায় পরস্পরে দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তখন আমাদের কান্না কে শুনে! যেখানে আমরা আছি, সেখানে মনুষ্যের সমাগম নাই। তখন আমাদের যে কি প্রকার ভয় উপ-স্থিত হইল, তাহা বলিতে পারি না। তখন আমরা তিন জন ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে মৃতপ্রায় হইলাম। আমাদের কাঁপিতে কাঁপিতে এই মাত্র ধ্বনি মুখে ছিল, দয়াময়! দয়াময়!

ঐ নদীর অপর পারে কয়েক ঘর লোকের বসতি। তাহারা কয়েক জন ঐ আগুন দেখিয়া এ পারে আসি-তেছে। ঐ নদীর এক জায়গায় অল্প জল ছিল, তাহারা সেই জায়গা দিয়া হাঁটিয়া পার হইল। পরে এ পারে

আসিয়া আমাদের কান্না শুনিয়া একজন বলিল, এ নদীর কূলে কাহার ছেলের কান্না শুনি। আর এক জন বলিল, ওরে! এ রায় মহাশয়দের বাটীতে আগুন লাগিয়াছে, এ বুঝি তাঁহাদের বাটীর ছেলেরা কাঁদিতেছে। এই বলিয়া ভয় নাই, ভয় নাই বলিতে বলিতে আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের তিন জনকে কোলে লইয়া ঐ আগুন দেখিতে চলিল।

এদিকে আমাদিগকে না দেখিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে বলিয়া সকলে হাহাকার শব্দ করিতেছে এবং আমাদের বাটীর সকলে মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছেন। এমত সময়ে ঐ কয়েক জন লোক আমাদিগকে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদিগকে পাইয়া অমনি আমা-দের বাটীর সকলে আমাদিগকে কোলে লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমাদের হারানতে আমাদের বাটীর জিনিস-পত্র আর কিছুই বাহির করা হয় নাই। ঘর দরজা জিনিস-পত্র এককালে সকলই পুড়িয়া গিয়াছে তাহা-তেও কাহার মনে কিছু খেদ হইল না, আমাদিগকে পাইয়া সকলে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। ঐ রাত্রে এক ভদ্র লোকের বাটীতে আমাদের রাখিলেন। পর দিবস প্রাতে বাটী আসিয়া দেখিতে লাগিলাম, যে আমাদের বাটীর সমুদয় পুড়িয়া গিয়াছে। ঐ সকল পোড়া-জিনিস স্থানে স্থানে রাশি রাশি পড়িয়া আছে। বেগুন গাছে বেগুন, বেল গাছে বেল এবং কলা গাছে কাঁদি সহিত কলা পুড়িয়া রহিয়াছে স্থানে স্থানে পোড়া হাঁড়ি, পাতিল খুঁটি, মুছি ভাঙ্গা চুরা

পুড়িয়া আছে। এই সকল দেখিয়া আমার মনে ভারী আহ্লাদ হইল। তখন আমি এ সমুদয় পোড়া জিনিস-পত্র আনিয়া খেলা করিতে লাগিলাম ; আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। বাড়ী পুড়িয়া গেলে সেই পোড়া ভিটার উপর পরমান্ন দিতে হয়. সেই পরমান্ন আমাদিগকেও খাইতে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের বাটীতে যে দয়ামাধব বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। তাঁহার সেবাতেও পরমান্ন ভোগ হইয়া থাকে। আমরা ঐ ভিটায় পরমান্ন খাইতেছি, ইতিমধ্যে আমার ছোট ভাই বলিল, এ পরমান্ন আমাদের দয়া-মাধবের প্রসাদ। আমি তাহার বড়, আমার তাহার অপেক্ষা বেশী বুঝার সম্ভব ; অতএব আমি বেশ বুঝিয়াছি, এবং নিশ্চয় জানিয়াছি, ঐ যে লোকে নদীর কূল হইতে আমা-দিগকে বাটীতে আনিয়াছে, সেই দয়ামাধব।

আমার ছোট ভাইয়ের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, হাঁ, দয়ামাধব আমাদের বড় ভাল বাসেন। কল্য দয়ামাধব আমা-দের কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল, ছি দিদি কি বলিলে ? দয়ামাধব কি মানুষ ? দয়ামাধবের মুখে কি দাড়ি আছে ? তখন আমি বলিলাম, মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও। কল্য আমরা ভয় পাইয়া দয়ামাধব দয়ামাধব বলিয়া ডাকিয়া-ছিলাম, এজন্য দয়ামাধব আসিয়া আমাদের কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছেন। আমার এই কথা শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল, সে দয়ামাধব নহে, সে মানুষ। ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম, ইতিমধ্যে আমার মা

আইলেন, এবং আমার কান্না দেখিয়া বলিলেন, উহাকে কাঁদাইতেছ কেন ? তাঁহার নিকট আমার ছোট ভাই আদ্য অন্ত সকল কথা বলিল, মা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। মা কি জন্য যে হাসিতেছেন, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরে মা বলিলেন, তোমার ছোট ভাই সে সকল কথা বুঝে। তোমার বুদ্ধি নাই, কিছুই বুঝ না। এস, আমি তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মা, এই বলিয়া আমাকে কোলে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন :—

তৃতীয় রচনা।

—০—

আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
বিষয় বিষেতে জরা মনে।
তাহাতে শকতিহীন, মৃত্যু প্রায় নিশিদিন,
আছি নাথ তব অদর্শনে॥
লজ্জা ভয়ে অঙ্গ দয়, কি বিহঙ্ক দয়াময়,
কি করিব না দেখি উপায়।
অধিনীর অনুরোধে, ত্বরায় প্রকাশ হৃদে,
কৃপা করি ওহে দয়াময়॥
করুণার কল্পতরু, কৃপাসিন্ধু বিশ্বগুরু,
কর দৃষ্টি করুণা নয়নে।
অকুল তরঙ্গে পড়ি, ভাসিছে রাসসুন্দরী,
তোমার চরণ তরি বিনে॥

আমার মা বলিলেন, এই যে, আমাদের দালানে ঠাকুর আছেন, তাঁহারি নাম দয়ামাধব, তিনি ঠাকুর। কল্য তোমাদের যে লোক নদীর কুল হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিয়াছিল, সে মানুষ। তখন আমি বলিলাম, মা তুমি বলিয়াছিলে, ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও, আমাদের দয়ামাধব আছেন। তবে যে কালি যখন ভয় হইল, আমরা দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া কত ডাকিলাম, আইলেন না কেন? মা বলিলেন, ভয় পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দয়ামাধব! দয়ামাধব! বলিয়া ডাকিয়াছিলে। দয়ামাধব তোমাদের কান্না

শুনিয়া ঐ মানুষ পাঠাইয়া দিয়া তোমাদিগকে বাটীতে আনিয়াছেন। আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্ব স্থানেই আছেন, এজন্য শুনিতে পান। তিনি সকলের কথাই শুনেন।

সেই পরমেশ্বর আমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে, তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও শুনিয়া থাকেন: এজন্য তিনি মানুষ নহেন, পরমেশ্বর। তখন আমি বলিলাম, মা! সকল লোক যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, সেই পরমেশ্বর কি আমাদের? মা বলিলেন, হাঁ, ঐ এক পরমেশ্বর সকলেরি, সকল লোকেই তাঁহাকে ডাকে, তিনি আদি কর্ত্তা। এই পৃথিবীতে যত বস্তু আছে, তিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকলকেই ভাল বাসেন, তিনি সকলেরই পরমেশ্বর।

বাস্তবিক পরমেশ্বর যে কি বস্তু, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সকল লোক পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, তাহাই শুনিয়া থাকি, এই মাত্র জানি। মা বলিলেন, তিনি ঠাকুর, এজন্য সকলের মনের ভাব জানিতে পারেন। মার ঐ কথা শুনিয়া আমার মন অনেক সরল হইল। বিশেষ সেই দিবস হইতে আমার বুদ্ধির অঙ্কুর হইতে লাগিল। আর পরমেশ্বর যে আমাদের ঠাকুর, তাহাও আমি সেই দিবস হইতে জানিলাম। আর আমার মনে অধিক ভরসা

হইল। পরমেশ্বরকে মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনেন, তবে আর কিসের ভয়, এখন যদি আমার ভয় করে, তবে আমি মনে মনে পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলিয়া ডাকিব। মার ঐ কথা আমার চিরস্থায়ী হইয়াছে, মা বলিয়াছেন, আমাদের পরমেশ্বর আছেন।

সেই দিবস হইতে মায়ের মহামন্ত্র পরমেশ্বর নামটি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। আমি আট বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদির্গের সঙ্গে ধূলা-খেলা করিতাম। আর দুই বৎসর বাহির বাটীর স্কুলে মেম সাহেবের নিকট বসিয়া থাকিতাম। এই অবস্থায় দশ বৎসর গত হইয়াছে। পরে আমাদের বাটী পুড়িয়া গিয়া বাটীর স্কুল ভাঙ্গিয়া গেল। সেই হইতে আমার বাহির বাটী যাওয়া রহিত হইল। আর আমি বাহির বাটীতে যাইতাম না, বাটীর মধ্যেই থাকিতাম। আমার মামা গৃহশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার ছোট একটি ছেলে ছিল, আমার মা ঐ ছেলেকে আনিলেন। আমি ঐ ছেলেটিকে দেখিয়া ভারী সন্তুষ্ট হইলাম। ঐ ছেলেটি আমি সকল দিবস কোলে করিয়া রাখিতাম, উহাকে লইয়াই আমি খেলা করিতাম. সে ছেলেটিও আমার কাছে থাকিতে থাকিতে আমার ভারী শরণাগত হইল। আমি তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতাম। এমন কি স্নান, আহার, নিদ্রা সকল সময়েই আমার কোলেই থাকিত, আমি তাহাকে একবারও কাঁদিতে দিতাম না।

আমাদের বাটীর নিকট জ্ঞাতি খুড়ার বাটী আছে। সেই বাটীতে এক খুড়ী মা ছিলেন। আমি ঐ ছেলেটি লইয়া

সেই খুড়ী মার নিকট সকল দিবস থাকিতাম। সে বাটীতে অধিক লোক ছিল না, খুড়ারা তিন জন, আর খুড়ী মা, আর ছেলেপিলে কএকটি মাত্র। সে খুড়ী মার হাতে পায়ে রসবাত বেদনা ছিল। আমি ঐ ছেলে লইয়া সকল সময় খুড়ী মার কাছে থাকিতাম, তিনি ঐ সংসারের সকল কাজ করিতেন, আর আমার কাছে বসিয়া ঐ সকল কাজের কথা বলিয়া বলিয়া কাঁদিতেন। আর বলিতেন, আমার মরণ হইলেই বাঁচি, আমি আর কাজ করিতে পারি না।

খুড়ী মার ঐ সকল খেদোক্তি শুনিয়া আমার মনে ভারী কষ্ট হইত। তখন আমি কোন কাজ করিতে জানি না, তত্রাপি খুড়ী মার কষ্ট দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এক দিবস আমি বলিলাম, তুমি বসিয়া থাক, আমি কাজ করি। তিনি বলিলেন, তুমি কি কাজ করিতে পার? আমি বলিলাম, আমাকে বলিয়া দিলে আমি সকল কাজই করিতে পারি। তিনি বলিলেন, তোমাকেতো কোন কাজ করিতে দেখিনে, তুমি কি কাজ জান, বিশেষ তোমাকে কাজ করিতে কেহ দেখিলে, আমাকে গালি দিবে। তখন আমি বলিলাম, তুমি কাহার নিকট বলিও না, আমাকে বলিয়া দাও, আমি কাজ করি।

তখন তিনি বলিয়া বলিয়া দিতে লাগিলেন, আমি আহ্লাদে নাচিয়া নাচিয়া সকল কাজ করিতে লাগিলাম। এই প্রকার করিয়া আমি ক্রমে ক্রমে ঐ খুড়ী মার কাছে যাবতীয় কাজ করিতে শিখিলাম। তিনি বসিয়া পাক করিতেন, আমি ঐ পাকের সমুদয় প্রস্তুত করিয়া দিতাম, এই প্রকার

কাজ করিতে করিতে আমিও পাক করিতে শিখিলাম। আমি ঐ বাটীর সকলকে পাক করিয়া দিতাম। আমি যে এ সকল কাজ শিখিয়াছি, আমাদের বাটীতে কেহ জানিত না। সে খুড়ী মা আমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন, আমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতাম।

এই প্রকারে কিছু দিবস যায়। এক দিবস আমি সেই খুড়ী মার মাথাতে তৈল দিতেছিলাম। ইতিমধ্যে আমার পিসী আইলেন। আমি পিসী মাকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া থাকিলাম, তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, মা! আমাকে দেখিয়া লুকাইলে কেন? তখন আমার ঐ খুড়ী মা বলিলেন, আমার মাথাতে তৈল দিতেছিল, পাছে তুমি কিছু বল, এই ভয়ে পলাইয়াছে। ঐ কথা শুনিয়া পিসী হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে আমাকে কোলে করিয়া আনিয়া বলিলেন, তুমি কি এখন কাজ করিতে পার, কাজ কোথায় শিখিয়াছ। খুড়ী মা বলিলেন, মেয়েতো বেশ কাজ জানে। আমি হাত পায়ের বেদনাতে নড়িতে পারি না, ঐ আমার সকল কাজ করিয়া দেয়। আমি উহার জন্যেই বাঁচি। পিসী শুনিয়া ভারী সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে কোলে লইয়া, আমাদের বাটীতে গিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা শুনিয়াছ, এই মেয়ে কত কাজ শিখিয়াছে, ও বাড়ীর বৌ রসবাতে মরে, কোন কাজ করিতে পারে না, সে বলিল, তাহার সকল কাজ, এমন কি, রান্না পর্য্যন্ত এই মেয়ে করিয়া দেয়। আমাদের বাটীর সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিল, আমার মা আমাকে

কোলে লইয়া আহ্লাদে ভাসিতে লাগিলেন। আমাকে বলিলেন, মা! কাজ কোথা শিখিয়াছ, কাজ করিয়া একবার দেখাও দেখি। তখন আমি আমাদের বাটীতেও কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই হইতে আমি বাটীর কাজ করিতাম। কিন্তু আমাদের বাটীতে আমাকে কেহ কাজ করিতে দিতেন না, আমি গোপনে গোপনে কাজ করিয়া রাখিতাম, তাহা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কত সোহাগ করিতেন। সেই হইতে আমার ধূলা-খেলা ভাঙ্গিল; আর খেলা ছিল না, আমি কেবল কাজই করিতাম।

এইরূপে সংসারের সমুদয় কাজ শিখিয়াছি। দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমি ঐ বাটীতে খুড়ী মার কাছে সেই ছেলেটি লইয়া সকল দিবস থাকিতাম। ছেলেটি আমার কাছে থাকিতে থাকিতে আমার ভারী অনুগত হইল। আমিও তাহাকে এক তিল ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না। দৈবাৎ সে ছেলেটি পীড়িত হইয়া মারা গেল। ছেলেটি মারা গেলে আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তখনও আমি ঐ খুড়ী মার কাছেই থাকিতাম। তখন আমার বয়ঃক্রম সম্পূর্ণ বার বৎসর। এত দিবস আমার এই সকল অবস্থায় গত হইয়াছে। এই বার বৎসর কাল আমি আমোদ আহ্লাদে পরিবারের নিকটে মার কোলে নির্ভাবনায় সুখে ছিলাম।

পরে ক্রমে ক্রমে আমার ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐ বার বৎসরে আমার বিবাহ হয়। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না, এক দিবস আমি খিড়কির ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি, সে সময় ঘাটে অনেক

লোক আছে। ইতিমধ্যে আমাকে দেখিয়া একজন লোক বলিল, এ মেয়েটীকে যে পাইবে, সে কৃতার্থ হইবে, সে কত কাল কামনা করিয়াছে। আর একজন বলিল, উহাকে লইবার জন্য কত জন আসিতেছে, দিলে এক্ষণেই লইয়া যায়, উহার মা দেয় না। আর এক জন বলিল, না দিলেও তো হবে না; এক জনকে দিতেই তো হবে, মেয়ে-ছেলে হওয়া মিছা।

ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার মনে ভারী কষ্ট হইতে লাগিল, আমি একবারে অবাক হইয়া থাকিলাম। পরে আমি বাটীতে গিয়া মাকে বলিলাম, মা! আমাকে যদি কেহ চাহে, তবে কি তুমি আমাকে দিবে? মা বলিলেন, সাট! তোমাকে কাহাকে দিব, এ কথা তোমাকে কে বলিয়াছে, কোথা শুনিলে, তোমাকে কেমন করিয়াই বা দিব। এই বলিয়া আমার মা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ঘরের মধ্যে গেলেন। আমি দেখিলাম, আমার মা কাঁদিতেছেন। অমনি আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, তখন আমি নিশ্চয় জানিলাম, আমাকে এক জনকে দিবেন। তখন আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি হইল, আমার মা আমাকে কোথা রাখিবেন।

ঐ কথা আমার মনের মধ্যে এত যন্ত্রণা দিতে লাগিল, সে আমার মন একবারে আচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িল, আর কিছুই ভাল লাগে না, আমি কাহার সঙ্গে কথাও কহি না, আর কোন কাজও করি না, আমার খেতেও ইচ্ছা হয় না, দিবা রাত্রি আমার কেবল কান্না আইসে। আমি ঐ কথা

মনে ভাবিয়া সর্ব্বদা মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। আর সকল সময়ই আমার চক্ষে জল পড়িত। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আমার শরীর এককালে শুকাইয়া গেল, এ সকল কথা আমার মনের মধ্যে থাকিত, ইহা আর কেহ জানিত না, কেবল পরমেশ্বর জানিতেন। আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া-ছিলাম, সকল লোকেই বলিত, যে, সকলেরি বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি, তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না; বিবাহ হয় এই মাত্র জানি। তখন সকল লোক আমাকে বলিতে লাগিল, তোমার বিবাহ হইবে। আমাকে যত্ন করিতে কেহ কখন ত্রুটি করেন নাই, তথাপি বিবাহ হইবে বলিয়া আরো যত্ন এবং স্নেহ করিতে লাগিলেন।

তখন আমার মনে বেশ আহ্লাদ উপস্থিত হইল; বিবাহ হইবে, বাজনা আসিবে, সকলে হুলু দিবে, দেখিব। আবার ভয়ের সহিত কত প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহা বলা যায় না। এই প্রকার হইতে হইতে ক্রমে দিন দিন ঐ ব্যাপারের জিনিস-পত্র সমুদয়ের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমেই সকল কুটুম্ব স্বজন বাটীতে আসিতে লাগিল। ঐ সকল দেখিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতে লাগিল। আমি কাহার সঙ্গে কথা কহি না, সকল দিবস কাঁদিয়াই কালযাপন করি। সকল লোক আমাকে কোলে লইয়া কত সান্ত্বনা করেন, তথাপি আমার মনের মধ্যে যে কি কষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাহা কিছুতেই যায় না।

পরে ক্রমেই আমোদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস অলঙ্কার, লাল সাড়ী, বাজনা প্রভৃতি দেখিয়া আমার

ভারী আহ্লাদ হইল। তখন আর আমার সে সকল মনে নাই। আমি হাসিয়া হাসিয়া সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। ঐ ব্যাপার সমাপন হইয়া গেলে পর দিবস প্রাতে সকল লোকে আমার মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওরা কি আজি যাবে? তখন আমি ভাবিলাম, ঐ যাহারা আসিয়াছে তাহারাই যাইবে, পরে আমাদের বাহির বাটীতে নানা প্রকার বাজনার ধুমধাম আরম্ভ হইল।

তখন ভাবিলাম, ঐ যাহারা আসিয়াছিল, এখন বুঝি তাহারাই যাইতেছে। এই ভাবিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলাম। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ঐ সকল লোক বাটীর মধ্যে আসিয়া যুটিল। দেখিলাম, কতক লোক আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কতক লোক কাঁদিতেছে। উহাই দেখিয়া আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। ক্রমে আমার দাদা, খুড়া, পিসী এবং মা প্রভৃতি সকলেই আমাকে কোলে লইয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঐ সকলের কান্না দেখিয়া আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। ঐ সময় আমি নিশ্চয় জানিলাম, যে মা, এখনি আমাকে দিবেন। তখন আমি আমার মার কোলে গিয়া মাকে আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলাম। আর মাকে বলিলাম, মা! তুমি আমাকে দিও না। আমার ঐ কথা শুনিয়াও এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া ঐ স্থানের সকল লোক কাঁদিতে লাগিলেন, এবং সকলে আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমার মা আমাকে কোলে লইয়া অনেক মতে সান্ত্বনা

করিয়া বলিলেন, মা আমার লক্ষ্মী, তুমিতো বেশ বুঝ, ভয় কি, আমাদের পরমেশ্বর আছেন, কেঁদ না, আবার এই কয়েক দিবস পরেই তোমাকে আনিব। সকলে শ্বশুর বাটীতে যায়, কেহতো তোমার মত কাঁদে না, তুমি কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলে কেন? স্থির হইয়া কথা বল, তখন আমার এত ভয় হইয়াছে যে, ভয়ে আমার শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, আমার এমন হইয়াছে যে, মুখে কথা বলিতে পারি না। তথাপি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, মা! পরমেশ্বর কি আমার সঙ্গে যাবেন? মা বলিলেন, হাঁ যাবেন বৈ কি, তিনি সঙ্গেই যাবেন, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন; তুমি আর কাঁদিও না। এই প্রকার বলিয়া অনেকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আমার ভয় এবং কান্না কিছুতে নিবৃত্তি হইল না। ক্রমেই আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

তখন অনেক কষ্টে সকলে আমার মায়ের কোল হইতে আমাকে আনিলেন। ঐ সময় আমার কি ভয়ানক কষ্ট হইল! সে কথা মনে পড়িলে এখনও দুঃখ হয়। বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে গিয়া থাম, এবং যাবজ্জীবন তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার, আপনার মাতাপিতা কেহ নহেন। এটি কি সামান্য দুঃখের বিষয়! কিন্তু ইহা ঈশ্বরাধীন কর্ম্ম, এই জন্য ইহা প্রশংসার যোগ্য বটে।

আমাকে যে কোলে লইতে লাগিল, আমি তাহাকেই দুই হাতে ধরিয়া থাকিতে লাগিলাম, আর কাঁদিতে লাগিলাম।

আমাকে দেখিয়া আবাল বৃদ্ধ সকলে কাঁদিতে লাগিল; এই প্রকারে সকলে আমাকে অনেক যত্নে আনিয়া দ্বিতীয় পাল্কীতে না দিয়া ঐ এক পাল্কীর মধ্যেই উঠাইয়া দিলেন। আমাকে পাল্কীর মধ্যে দিবামাত্রই বেহারারা লইয়া চলিল, আমার নিকট আমার আত্মবন্ধু কেহই ছিল না, আমি এককালে বিপদ সাগরে পড়িলাম, আমি আর কোন উপায় না দেখিয়া মনের মধ্যে এই মাত্র বলিতে লাগিলাম, পরমেশ্বর! তুমি আমার কাছে থাক। মনে মনে এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার মনের ভাব কি বিষম হইয়াছিল! যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল। আমি আমার পরিবারগণকে না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, আর মনের মধ্যে একান্তমনে কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম, আমার মা বলিয়াছেন, তোমার ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও।

ঐ কথা মনে ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, এই প্রকার কাঁদিতে কাঁদিতে আমার গলা শুকাইয়া গেল, এবং ক্রন্দন-শক্তিও রহিত হইয়া গেল।

চতুর্থ রচনা।

—o—

ওহে প্রভু বিশ্বেশ্বর, বিশ্বব্যাপী বিশ্বম্ভর,
বিশ্বের ঈশ্বর বিশ্বময়।
জননীর কোল ত্যজি, অতিশয় দুঃখে মজি,
তোমারে ডাকি হে পেয়ে ভয়॥
বন্ধুগণ অদর্শনে, অধৈর্য্য হয়েছি মনে,
আ'মার কাঁপিছে হৃদয়।
কেঁদেছি জননী বোলে, আপনি নিয়াছ কোলে,
জননী হইয়া সে সময়॥
তখন ব্যাকুল মনে, ভক্তিভাবে প্রাণপণে,
তোমারে ডেকেছি অবিশ্রাম।
অম্নি এসে কোলে করি, নিবারি নয়নবারি,
পূর্ণ করিয়াছ মনস্কাম॥
সঙ্গে সঙ্গে আছ সদা, পড়িলে বিপদে কদা,
হস্ত ধরি করেছ উদ্ধার।
অতুল করুণা তব, ভুলিয়া আছি সে সব,
ধিক ধিক জীবন আমার॥

আর কাঁদিতে পারি না। ইতিমধ্যে ঘোরতর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলাম। পরে কোথা গিয়াছি, তাহার কিছুই জানি না।

পর দিবস প্রাতে জাগিয়া দেখিলাম, আমি এক নৌকারি উপরে রহিয়াছি। আমার নিকট আমার আত্মীয়বর্গ কেহই

নাই, আর যত লোক দেখিতে লাগিলাম, ও যত লোকের কথা শুনিতে লাগিলাম, তাহার মধ্যে এক জন লোকও আমি চিনি না এবং কাহাকেও কখন দেখি নাই। তখন আমি কাঁদিতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম, আমার মা কোথা রহিলেন, আমার পরিবারগণ বা কোথা রহিল, গ্রামের প্রতিবাসিনীগণ যাহারা আমাকে বিস্তর স্নেহ করিতেন, তাঁহারা কোথা গেলেন, আমার খেলার সঙ্গিনীগণ বা কোথা রহিল, আমি বা কোথা যাইতেছি। এই ভাবিয়া আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এই প্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার কান্না দেখিয়া ঐ নৌকার সকল লোক আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। উহাদের সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া, আমার বাটীর সকলের স্নেহের কথা মনে পড়িয়া, আমার মনের খেদ যেন উথলিয়া উঠিল। আমার চক্ষের জল একবারে শতধারে পড়িতে লাগিল, কিছুতেই রক্ষা হয় না। কাঁদিতে কাঁদিতে আমার প্রাণ শ্বাসগত হইল, আর কাঁদিতেও পারি না। আমি কখন নৌকাতে চড়ি নাই, আমার এ জন্য ঘুরও লাগিল। তখন আমি এ সকলের আশায় নিরাশ হইয়া মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। তখন আমার মনে কেবল এক মাত্র ভয়। কিন্তু মা বলিয়াছেন, ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও। সেই নামটি জপ করিতে লাগিলাম।

আহা! আমি যে তখন কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা কেবল সেই বিপদভঞ্জনই জানেন, অন্য কেহ জানে না।

এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন।
পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী, জালে বন্দী মীন॥

সে যাহা হউক, পরমেশ্বরের নির্ব্বন্ধ, আমার আক্ষেপ করা নিরর্থক। বিশেষতঃ আমার পূর্ব্বের মনের ভাব কি প্রকার ছিল, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। আর সকল মেয়ের মনে কি প্রকার হয়, জানি না, বোধ হয়, এত কষ্ট তাহাদিগের না হইলেও না হইতে পারে। মনের কষ্টের কারণতো কিছুই দেখা যায় না, তথাপি নিজ পরিবার ছাড়িয়া আসিয়া আমার চক্ষের জল অহরহ ঝরিত।

লোকে আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই। কয়েক দিবস নৌকার উপরে থাকা হইল। এক দিবস শুনিতে লাগিলাম, নৌকার সকল লোক বলিতে লাগিল, আজি আমরা বাটী যাইব। তখন আমার মনে একবার উদয় হইল, বুঝি আমাদের বাটীতেই যাইব, আবার ভয়ের সহিত কত প্রকার ভাবনা হইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই। এই প্রকারে যে কি ভাবনা হইতে লাগিল, তাহা পরমেশ্বরই জানেন, মুখে বলা বাহুল্য। তখন কেবল কান্নাটিই আমার সম্বল হইল, দিবারাত্র কান্নাতেই কাল-যাপন হইত।

আহা! জগদীশ্বর! তোমার কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তোমার নিয়মের শত শত ধন্যবাদ দিই। আত্মাধিক জননী, এবং স্নেহপূর্ণ পরিবারগণ এ সকলকে ত্যাগ করাইয়া কোথা

হইতে কোথায় আনিয়াছ। সেই দিবস রাত্রে নৌকা হইতে ঐ বাটীতে গিয়া দেখিতে লাগিলাম, কত প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইতেছে, কত প্রকার লোক দেখিতে লাগিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার মধ্যে একজন লোকও আমাদের দেশের নয়, কাহাকেও আমি চিনি না, এজন্য আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমার এমন হইল যে, একচক্ষে শতধারে জল পড়িতে লাগিল। সকলে আমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কাঁদিও না, এই ঘর, এই সংসার, এই সকল লোক জন যা কিছু আছে সকলি তোমার। এখন এই বাটীতেই থাকিতে হইবে, এই সংসারেই করিতে হইবে, কি জন্য কাঁদ, আর কাঁদিও না। সে সময় সেই সান্ত্বনা বাক্যে প্রাণাধিক প্রিয়তম পিতৃগৃহের পরিবারদিগের আশায় নিরাশ হইয়া আমার মন একেকালে শোকানলে দগ্ধীভূত হইয়া গেল। যাঁহারা এ সকল বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাঁহারা বোধ হয় এ প্রকার বাক্য বলিয়া সান্ত্বনা করেন না। যেমন এক জনের সন্তান বিয়োগ হইলে যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে সান্ত্বনা করেন যে, ছি ছি! তুমি কাহার জন্য কাঁদ, ও যে তোমার কত জন্মের শত্রু ছিল, সে তোমার ছেলে ছিল না, তাহা হইলে এমন করিয়া যাইত না। এমন ডাকাতের নাম কি আর মুখে আনিতে আছে?

এইরূপ বলিয়া সান্ত্বনা করিলে কি সান্ত্বনা হয়? কখনই নহে। এরূপ ব্যাকুলতার সময়ে এ প্রকার সান্ত্বনাতে মন কদাপিও শান্ত হইতে পারে না। যেমন জ্বলন্ত অগ্নির উপরে

তৃণরাশি দিলে আরো জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ ঐ সকল সান্ত্বনা বাক্যে শোকসাগর উথলিয়া উঠে। ঐ সকল সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া আমার প্রাণ আতঙ্কে উড়িয়া গেল। তখন আমার কোন সাধ্যই নাই, কোন উপায় নাই। কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতেছি। আর দুই চক্ষে বারিধারা ঝরিতেছে। তখন আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাকে কোলে লইয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, আহা! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। একি অপূর্ব্ব ঘটনা! কৌশলের বালাই লইয়া মরি। কোন্ গাছের বাকল কোন গাছে লাগিল।

তাঁহার সেই কোল যেন আমার মায়ের কোলের মত বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেরূপ স্নেহের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি আমারি মা। অথচ তিনি আমার মায়ের আকৃতি নহেন। আমার মা বড় সুন্দরী ছিলেন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী শ্যামবর্ণা; এবং আমার মার সহিত অন্য সাদৃশ্যও ছিল না। তথাপি তিনি কোলে লইলে আমি মা জ্ঞান করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিতাম। আমার কান্না এবং ভয়ের কোন কারণ ছিল না। আমার বাপের বাটীতে সকলে আমাকে যে প্রকার স্নেহ ও যত্ন করিতেন, এখানে তাহার অধিক স্নেহ ও যত্ন হইতে লাগিল। আমাকে এক তিলও মাটিতে নামান হইত না, সকল দিবস আমাকে কোলেই রাখা হইত। তথাপি আমার এত ভয় ছিল, দিবারাত্রি ভয়ে আমার কলেবর কম্পিত হইত। সর্ব্বদা আমার চক্ষের

জলে বুক ভাসিয়া যাইত। আর আমি মনে মনে অহরহঃ কেবল পরমেশ্বরকে ডাকিতাম :—

হে করুণাময় পিতা পরমেশ্বর! জানিলাম তোমার অসীম করুণা। তখন যে আমি তোমাকে অহরহঃ ডাকিয়া মনে রাখিতাম, সে কেবল আমার ভয়ের জন্য মাত্র। তোমার নাম যে এত গুণবিশিষ্ট, তাহা আমি কিছু জানিতাম না। আমার মা বলিয়াছিলেন, ভয় হইলে পরমেশ্বরকে ডাকিও। আমি সেই জন্য প্রাণপণে তোমাকে ডাকিতাম। যা হউক, আমি যে তোমার মাহাত্ম্য না জানিয়াই সর্ব্বদা একান্ত মনে তোমাকে ডাকিতাম, সেও তোমারি কৃপা মাত্র।

যে তোমারে ডাকে নাথ পড়িয়া সঙ্কটে।
জেনেছি তাহারে দয়া কর অকপটে॥

প্রথম বার যাওয়াতেই আমার তিন মাস থাকা হয়, ঐ তিন মাস আমি মাতৃহীন সন্তানের ন্যায় দিবারাত্রি কান্নাতেই কালযাপন করিয়াছিলাম। পরে তিন মাস অতীত হইলে আমার খুড়া আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। তখন আমি আমার মায়ের কোলে বসিয়া মা! আমাকে পরকে দিয়াছিলে কেন? বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তাহা শুনিয়া সকল লোক হাসিতে লাগিল! আমার মা আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, দেখ, যাহারা তোমার ছোট, তাহারাতো তোমার মত কাঁদে না, সকলেই শ্বশুর বাটী গিয়া থাকে। তোমার আর কত দিনে বুদ্ধি হইবে, কত দিনেই বা পরমেশ্বর সদয় হইয়া তোমাকে ভাল বুদ্ধি দিবেন? তুমি না জানি

কতই বা কাঁদিয়াছিলে। মা আমাকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় আমার সকল আত্মীয় বন্ধু আসিয়া আমাকে ঘিরিল। তখন আমি আমার আত্ম বন্ধু-বান্ধবকে এবং খেলার সঙ্গিনী সকলকে দেখিয়া, মহা আনন্দিত হইলাম, আর ও সকল দুঃখের কথা কিছু মনে থাকিল না। সকল ভুলিয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। সেই দিন যে কি আনন্দের দিন, সে আনন্দ বর্ণনাতীত, তখন যেমন অল্পেই কান্না উপস্থিত হইত, পরমেশ্বর তেমনি আনন্দও দিয়াছিলেন। আমি ঐ সকলের সঙ্গ পাইয়া আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। যা হউক, বাল্য কালের পর আর কাল নাই, তখন আমার বয়ঃক্রম বার বৎসর। এই বার বৎসর অবধি আমার এই প্রকার অজ্ঞান অবস্থাতে গত হইয়াছে। তখনও আমি পাঁচ বৎসরের মেয়ের মত ব্যবহার করিতাম। ছি ছি! আমি এমন ছিলাম, যে আমার বুদ্ধিমাত্রও ছিল না, এই জন্য সকলে আমাকে নির্ব্বোধ বলিত। বিবাহের পরে আমার খুড়া আমাকে এক বৎসর শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই। ঐ এক বৎসর আমি মার কাছে সচ্ছন্দচিত্তে কালযাপন করিয়াছিলাম। এক বৎসর পরে আবার আমায় যাইতে হইল। সেই বার গিয়া দুই বৎসর থাকা হইল। আমি পূর্ব্বের মতই সকল দিবস কাঁদিতাম, কিন্তু ঐ বাটীর লোক জন ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে আমি অল্প অল্প চিনিতে লাগিলাম, আমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতাম না, কেবল মনে মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। পরমেশ্বরের সঙ্গেই যা

কিছু কথা হইত। আর আমার বাপের বাড়ীর সকলের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া কাঁদিতাম। আমার চক্ষে জল ছাড়া হইত না। পক্ষীটা, কি গাছটা, কি কুকুরটা, কি বিড়ালটা যা দেখিতাম, আমার জ্ঞান হইত যে, আমার বাপের দেশ হইতে আসিয়াছে, এই ভাবিয়া কাঁদিতাম। পিত্রালয়ে আমার অতিশয় সোহাগ ছিল। লোকে মেয়েকে কত গালি দেয় এবং মায়ে কত মারিয়াও থাকে, মারি দূরে থাকুক, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে কেহ বড় করিয়া কথাও বলে নাই, ফলতঃ আমার বড় সোহাগ ছিল। পরে নূতন জায়গায় গিয়া নূতন বৌ হইলাম, এখানেও আমার আদরের ত্রুটি হয় নাই, বৌ হইয়া আমার সোহাগের কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার খেলাবার জন্য কত প্রকার জিনিস আনিয়া আনিয়া দিতেন। আর ঐ গ্রামের সকল বালিকাদিগকে ডাকিয়া আমার নিকট আনিয়া দিতেন। ঐ বালিকাগণ খেলা করিত, আমি বসিয়া দেখিতাম, ঐ প্রকারে কতক দিবস গত হইয়াছে। তখনও আমি গোপনে গোপনে কাঁদিতাম বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সকল দিন থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের পোষা পাখী হইয়া তাঁহাদেরি শরণাগত হইলাম। বাল্যকালের সকল কথাই আমার ,যেন ছাইমাটির মত বোধ হয়, যাহা হউক আমিতো লিখিয়া বসিলাম।

হে পিতা দয়াময়! তুমিতো নিকটেই আছ, এবং মনেই আছ, তবে কেন মনে নানা প্রকার বৈকল্য উপস্থিত হয়, বুঝিতে পারি না।

যেখানে পিতা দয়াময়,
সেখানে আবার কিসের ভয়।
যেখানে আছ তুমি পিতা,
সেখানে আবার ভয়ে ভীতা।
যেখানে তোমার নাম সম্বল,
সেখানে কিসের অমঙ্গল।
যেখানে তোমার নামের ধ্বনি,
সেখানে কি ভূত পেত্নিনী।
যেখানে তোমার নামামৃত,
সেখানে সব হয় অমৃত।

ঐ বাটীতে নয় জন চাকরাণী ছিল, তাহার মধ্যে ঘরের কাজ করা চাকরাণী এক জন, আর আট জন বাহিরের লোক, তাহারা বাহিরে কাজ করিত। আমার কোন কাজ করিতে হইত না। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী পাক করিতেন, আমাকে কিছু কাজ করিতে দিতেন না। আমি সকল দিবস বসিয়া থাকিতাম। ঐ গ্রামের বালিকাগণ আমার নিকটে সকল দিবস থাকিত। ঐ বাটীর চাকরাণীগণ এবং ঐ সকল বালিকা সকল দিবস আমাকে লইয়া আমোদ করিত, এবং খেলাও করিত। আমি সকল সময় একত্রে থাকিতে থাকিতে তাহাদিগের সঙ্গে আমার ভারী প্রণয় হইল। আমার পিত্রালয়ে যেমত বালিকাগণের সঙ্গে প্রণয় ছিল, ইঁহাদের সঙ্গেও তেমনি প্রণয় হইল। তখন আমি পূর্ব্বের মত তত কাঁদিতাম না, তথাপি কান্না ছিল; কিন্তু কিছু কম পড়িল। আমাকে কেহ কোন কাজ করিতে

দিতেন না, আমি সকল দিবস নিরর্থক বসিয়া থাকিতাম, আর মনে মনে ভাবিতাম, আমি কি কাজ করিব। সংসারের সমুদয় কাজতো চাকরাণীতেই করে, ঘরের কাজে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আছেন, তাঁর উপরে চাকরাণীও আছে। তখন মেয়েছেলেদে লেখা পড়া শিখাইত না। আমি কি কাজ করিব, কিছুই পাই না। এখনকার মত পয়সা তখন ছিল না, সে সময় কেবল কড়ি ছিল, ঐ কড়িতেই সকল কারবার চলিত, আমি ঐ কড়ি আনিয়া নানাবিধ জিনিস তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলাম। ঝাড়, পদ্ম, আরসী, ছত্র, আলনা, ছিকা এই সকল বানাইয়া ঘরে লটকাইয়া রাখিতাম।

আর পাতর কাটিয়া ক্ষীরের ছাঁচ করার জন্য সঞ্চ বানাইতাম; পাট দিয়া ছিকা বানাইতাম; মাটি দিয়া পুতুল, ঠাকুর, মুছি, সাপ, বাঘ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, মানুষ, গরু, এবং পক্ষী ইত্যাদি যা দেখিতাম তাহাই বানাইতাম। এক দিবস মাটির এক সাপ বানাইয়া তাহার গায়ে রং দিয়া সাজাইয়া ঘরের মধ্যে খাটের নীচে রাখিয়াছিলাম; সে সাপ বানাইতে কেহ দেখে নাই। পরে ঐ সাপ দেখিয়া এক জন লোক গিয়া বাহির বাটীর কাছারীর সকল লোককে ডাকিয়া আনিল। মাটীর সাপ দেখিয়া সত্য জ্ঞান করিয়া মারিতে চেষ্টা করিল। কেহ বা লাঠী হাতে, কেহ বা সড়কি লইয়া ঘরের আড়ার উপর উঠিল, কেহ বা দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে লাগিল; আমি ইহার কিছুই জানি না! আমি যদি জানিতাম তাহা হইলে বলিতাম ও মাটির সাপ; এত লোক যে নিরর্থক

পরিশ্রম করিতেছে, তাহা আমি জানি না। ঐ মাটির সাপ দেখিয়া সকলে ভারী ভয় পাইয়াছে। বাস্তবিক সে সাপ বড় মন্দ হয় নাই, দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। ঐ সাপ যেন ফণা তুলিয়া গর্জ্জিতেছে। দেখিয়া ভয়ে কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিতেছে না। এক জন আড়ার উপরে থাকিয়া সাপকে যেমন দণ্ডাঘাত করিবে, অমনি সেই মাটির সাপ ভাঙ্গিয়া গেল। আর সকল লোক হাসিয়া গোল করিতে লাগিল। আর আমি শুনিলাম, ঐ মাটির সাপ লইয়া সকলে গোল করিতেছে। এজন্য আমি ভারী লজ্জিত হইলাম। সেই অবধি আমি আর কিছু বানাইতাম না। কিন্তু মনের মধ্যে বোধ হইত, কেবল মিছা আমোদে কালহরণ হইতেছে। ইহাতে কিছুই ফল নাই, সময় মিথ্যা নষ্ট হইতেছে।

এত দিবস আমার এই অবস্থায় গত হইল। পরে অল্প দিবস মধ্যেই আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী সান্নিপাতিকের পীড়ায় দৃষ্টিহীন হইলেন, আর কোন কাজ করিতে পারেন না। তখন তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় কাজ পর্য্যন্ত আমাকে করিতে হইত। অধিকন্তু ঐ সংসারের সমুদয় কাজের ভারও আমার উপর পড়িল। তখন আমার অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি কি করিব, ভাবিতে লাগিলাম, এখানে আসা পর্য্যন্ত আমাকে কোন কাজ করিতে দেন নাই। বিশেষতঃ ঐ সংসারটি বড় কম নহে, দস্তুর মতই আছে। বাটীতে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাঁহার সেবাতে অন্নব্যঞ্জন ভোগ হয়। বাটীতে অতিথি, পথিক সতত আসিয়া

খাকে, তাঁহাদিগকে বাটীর মধ্য হইতে সিধাপত্র দেওয়া হয়। এদিকে রান্নাও বড় কম নহে। আমার দেবর ভাশুর কেহ ছিল না বটে, কিন্তু চাকর চাকরাণী প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন বাটীর মধ্যে ভাত খাইত, তাহাদিগকে দুবেলাই পাক করিয়া দিতে হইত। বিশেষতঃ ঠাকুরাণী চক্ষুহীন হইয়াছেন, তাঁহার সেবাও সর্ব্বোপরি। অধিকন্তু ঘরের কাজের জন্য একটি লোকমাত্র ছিল, তখন সে লোকও ছিল না। ঘরের মধ্যে আমি একামাত্র হইলাম। আমি ব্যাকুলচিত্তে ঐ সকল কাজের তরঙ্গ দেখিতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম। আমাহইতে এত কাজ হওয়ার কোন মতেই সম্ভাবনা নাই। আমি মনে মনে এই চিন্তাটি অধিক করিতে লাগিলাম। হে দীননাথ! আমার শক্তিতে যে এসকল কাজ সুসম্পন্ন হয়, এমন ভরসাও করি না। তবে যদি হয়, সে তোমার নিজ গুণে, তুমি যা কর তাই হবে। আমি এই প্রকার পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া ঐ সমুদয় কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল কাজ আমার পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছায় এমন সহজ হইল যে, আমি একাই দুবেলা পাক করিতে পারগ হইলাম, আর সমুদয় কাজ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। তখন মেয়েছেলেরা লেখা পড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়া দাওয়ার কর্ম্ম সারিয়া যে কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্ত্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহ কর্ম্ম বৈ আর কোন কর্ম্মই নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল। বিশেষতঃ তখন

মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। সে কালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম। আর যে সকল লোক ছিল, কাহার সঙ্গেই কথা কহিতাম না। সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না। এই প্রকার সকল বিষয়ে বৌদিগের কর্ম্মের রীতি ছিল। আমি ঐ রীতিমতেই চলিতাম।

পঞ্চম রচনা।

প্রভু পরাৎপর, পরম ঈশ্বর,
অনাদি অনন্ত যেই।
সে ধন সাধন, কর ওরে মন,
পরম কারণ সেই॥
হইয়া মগন, ডুবেছ রে মন,
অগাধ বিষয়-নীরে।
নাই তার কূল, হায় একি ভুল,
ভুলিয়া রয়েছ তাঁরে॥
জানিহ নিশ্চিত, আছে রবিসুত,
বিস্মৃত হয়েছ কেন।
জেনে কি জান না, সব প্রবঞ্চনা,
পতি সুত ধন জন॥
নিজ পরিবার, ভাবি আপনার,
পালিছ জনম হতে।
শমন-ভবন, করিলে গমন,
কেহই থাকে না সাথে॥

মিছা ধন জন, করিছ যতন,
সকলি পড়িয়া রবে।
ভেবে দেখ মন, একাই এসেছ,
একাই যাইতে হবে॥
এসেছ এ ভবে, যাঁহার প্রভাবে,
যেতে হবে তাঁরি পাশে।
তবে কেন মন, ভুলিলে এখন,
বন্দী হয়ে মায়াপাশে॥
মন তোরে অতি, করি রে মিনতি,
যেও না এ মায়া পথে।
সেই পরাৎপর, পরম ঈশ্বর,
ভাব মন বিধিমতে॥
পাইবে সে ধন, অমূল্য রতন,
জ্ঞান ধন যদি রয়।
অভয়-চরণ, লও রে শরণ,
রবে না শমন-ভয়॥
এই ভবনদী, তরিবে হে যদি,
তবে কেন ভুল হয়।
পথের সম্বল, জানিবে কেবল,
সেই দীন দয়াময়॥

আমি প্রাতঃকাল হইতে ঐ সমুদয় কাজ করিতে আরম্ভ করিতাম, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কাজের শেষ হইত। ইতিমধ্যে আমার বিশ্রাম ছিল না। কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ঐ সকল কাজ আমার কর্ত্তব্য কাজ বোধ

হইত। একবারও আমার বিরক্তি বোধ হইত না। এই প্রকারে ক্রমেই ঈশ্বরেচ্ছায় সাংসারিক সমুদয় কাজ আমা হইতেই সমাধা হইতে লাগিল। তখন আমার বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর মাত্র। তখন আমার মনে মনে নিতান্ত চেষ্টা হইল যে, আমি লেখা-পড়া শিখিয়া পুথি পড়িব। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখা-পড়া শিখিত না। তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়ে-ছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনুসে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখি। এখন যে মত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখা-পড়া শিখিবে।

দশ পাঁচ জন এক স্থানে বসিয়া এই প্রকার আলাপ হইত। ঐ সকল কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইত। আমার মনের কথা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, কেহ জানিবে বলিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপিত। এমন কি, যদি এক খানি লেখা কাগজ দেখিতাম, তাহাও লোকের সম্মুখে তাকাইয়া দেখিতাম না। পাছে কেহ বলে যে, লেখা-পড়া শিখিবার জন্যই দেখিতেছে। কিন্তু আমি মনের সহিত সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম, হে পরমেশ্বর। তুমি আমাকে লেখা-পড়া শিখাও, আমি

লেখা-পড়া শিখিয়া পুথি পড়িব। হে দীননাথ! তখন যে তোমাকে আমি ডাকিতাম, সে এই উপলক্ষে মাত্র। আর মনে মনে বলিতাম, পরমেশ্বর! তুমি আমাকে কোথা হইতে কোথা আনিয়াছ। আমার জন্মভূমি পোতাজিয়া গ্রাম, আর এই তিন দিবসের পথ রামদিয়া। তুমি আমার আত্মীয় বন্ধু সকল ত্যাগ করাইয়া এত দূরে আনিয়াছ। এখন এই রামদিয়া গ্রামই আমার বাস্তভূমি, কি আশ্চর্য্য! আমি যখন কোন কাজ করিতে জানিতাম না, তখন এক আদখানি কাজ যদি করিতাম, আমার মা সেই কাজ দেখিয়াই কত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। সেই কাজের কথা বলিয়া বলিয়া কত আহ্লাদ করিতেন। এখন আমি পরাধিনী হইয়া এত কাজ শিখিয়াছি যে, আমি এত লোকের কাজ করিতে পারি। এখন এই সকল লোক আমার অন্তরঙ্গ হইয়াছে, আমি মনে মনে এই সকল কথা বলিয়া কাঁদিতাম। সে কান্না অন্য কেহ জানিত না। আমি ঘোমটার ভিতরে কাঁদিতাম, তাহা আর কে জানিবে! দীননাথ কেবল তুমি জানিয়াছ। হে পিতা পরমেশ্বর! হে মনের মন! হে জীবনের জীবন! হে দয়ার সাগর দয়ানিধি! তোমার দয়ার স্রোতে অহো-রাত্র ভাসিতেছি। তুমি আমার বিপদ্ সম্পদে সকল সময়েই সঙ্গে সঙ্গে আছ, আমার মনে যখন যে ভাব হইয়াছে, তাহা সকলি তুমি জান, তোমার অগোচর কিছুই নাই।

আমি বার বৎসরের সময় পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া রামদিয়া গ্রামে আসিয়াছি। আর এই পর্য্যন্ত সেই

স্নাগদিয়াতেই আছি! কিন্তু এই বাটীর সমুদয় লোক বড় সজ্জন ছিলেন, আমাকে ভারী স্নেহ করিতেন, এমন কি, যদি আমার কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইত, তাঁহাদের স্নেহগুণে সে যন্ত্রণা আমার যন্ত্রণাই বোধ হইত না।

ঐ বাটীর চাকর চাকরাণী এবং গ্রামের প্রতিবাসিনী প্রভৃতি সকল লোক আমাকে এত স্নেহ করিত যে, আমার নিশ্চয় বোধ হইত, যেন পরমেশ্বর ইহাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। আমার মনে আর একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যেন ঐ গ্রামের লোক তাঁহাদিগের নিজ পরিবার অপেক্ষাও আমাকে স্নেহ করেন। বাস্তবিক আমার প্রতি কেহ কখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ দেশের সমুদয় লোকই বড় সজ্জন। আমি এতকাল ঐ দেশে বাস করিতেছি, এবং এখন পর্য্যন্তও আছি। (ইহার মধ্যে আমার পরিবারেরতো কথাই নাই) ঐ দেশের সকল লোক আমার প্রতি অকপট স্নেহ করিয়া থাকেন। মনের ভ্রমেও কেহ কখন আমাকে কটু-বাক্য বলেন নাই। এখন পর্য্যন্তও সেই ভাবটি আছে, পরে কি হয় বলা যায় না। এখানে আমার আর কত দিবস থাকিতে হইবে। শেষ দশাতে আমার কি প্রকার অবস্থা ঘটিবে, এবং সেই সকল লোকেরা আমার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিবেন, জানি না; তাহা পরমেশ্বর জানেন।

হে প্রভু! বিশ্বময়! বিশ্বপাতা! তোমার অসীম মহিমা, তুমি কখন্ কি কর, কে জানিতে পারে, তোমার কথা

তুমি জান। এবিষয়ে আমাদের চিন্তা করাই ভ্রম। আমি বার বৎসরের সময় রামদিয়া গ্রামে আসিয়াছি। আর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নূতন বৌ ছিলাম। মনের ভাক্‌টিও ছেলেম মতই ছিল। এই আঠার বৎসর আমার এই অবস্থায় কালগত হইয়াছে। কিন্তু এই আঠার বৎসর পর্য্যন্ত আমার মনটি বড় বেশ ছিল। সাংসারিক বিষয় চিন্তার কোন কারণ ছিল না, কেবল সর্ব্বদা গৃহ-কার্য্য করিব, আর কোন্ কর্ম্ম করিলে লোকে ভাল বলিবে, কি প্রকারে সকলের মন সন্তোষ থাকিবে, এই চেষ্টাটি ছিল। কিন্তু এইটি ভারি আক্ষেপের বিষয় ছিল যে, মেয়েছেলে বলিয়া লিখিতে পড়িতে পাইতাম না। এসনকার মেয়েছেলেদিগের কি সুন্দর কপাল! এখন মেয়ে জন্মিলে অনেকেই বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করেন। যাহা হউক, এ মত ভালই বলিতে হইবেক।

এক্ষণে আমার যে কয়েকটি সন্তান হয়, তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে। আমার বয়ঃক্রম যখন ১৮ বৎসর, তখন আমার একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম বিপিনবিহারী। যখন আমার ২১ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম পুলিনবিহারী। আমার ২৩ বৎসরের সময় আর একটি কন্যাসন্তান হয়, তাহার নাম রামসুন্দরী। ২৫ বৎসরের সময় আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম প্যারীলাল। ২৮ বৎসরের সময় আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম রাধানাথ। যখন আমি ৩০ বৎসরের, তখন আর

একটি পুত্র সন্তান হয়, তাহার নাম দ্বারকানাথ। যখন আমি ৩২ বৎসরের, তখন আমার আর একটি পুত্র সন্তান হয়, তাহার নাম চন্দ্রনাথ। আমি যখন ৩৪ বৎসরের, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম কিশোরীলাল। তাহার পরে আর একটি পুত্রসন্তান ছয় মাস গর্ভবাস করিয়াই গত হয়। পরে যখন আমি ৩৭ বৎসরের, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহার নাম প্রতাপচন্দ্র। তাহার পর যখন আমি ৩৯ বৎসরের, তখন আর একটি কন্যাসন্তান হয়, তাহার নাম শ্যামসুন্দরী। পরে আমি যখন ৪১ বৎসরের, তখন আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটি জন্মে, তাহার নাম মুকুন্দলাল। ১৮ বৎসরে আমার প্রথম সন্তানটি হয়, আর ৪১ বৎসরে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না। ঐ বাটীতে আটজন চাকরাণী ছিল, তাহারা বাহিরের লোক। সে সময় ঘরের কাজের লোক ছিল না। ঘরের মধ্যে আমি একা মাত্র ছিলাম। আমি পূর্ব্বের ঐ নিয়ম মত সংসারের সমুদয় কাজ করিতাম। অধিকন্তু ঐ কয়েকটি সন্তান পালন করিতে হয়। এই সকল কাজের গতিকে আমার দিবারাত্র বিশ্রাম ছিল না। আর অধিক কি বলিব, আমার শরীরের যত্নমাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ে যত্ন দূরে থাকুক, দুবেলা আহার প্রায় ঘটিত না; কাজের গতিকে কোন দিবস একবার আহারও ঘটিত না। এমনি কাজের ভিড় ছিল।

যাহা হউক, সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই। বলিতেও লজ্জা বোধ হয় এবং বলাও বাহুল্য। তত্রাপি সংক্ষেপে দুই এক দিবসের কথা বলা আবশ্যক বটে। আমি ঐ ছেলে গুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম। ঐ ছেলে কয়েকটি না উঠিতে অন্ন পাক করিতাম। উহাদের খাওয়ান হইলে পরে অন্যান্য কাজ মিটাইয়া বিগ্রহ-সেবায় যাহা দিতে হয় তাহা সমুদয় দিয়া, আমাদের ঘরের রান্নার সকল আয়োজন করিয়া পাক করিতাম। সে পাকও নিতান্ত কম নহে। এক সন্ধ্যা দশ বার সের চাউল পাক করিতে হইত। এ দিকে বাটীর কর্ত্তাটির স্নান হইলেই ভাত চাই, অন্য কিছু আহার করিতে বড় ভাল বাসিতেন না। এজন্য অগ্রে তাঁহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। পরে অন্যান্য সকল লোকজনের জন্য পাক হইত। এই প্রকার পাক করাতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত।

এক দিন এই সকল খাওয়া দাওয়া মিটাইয়া আমি যখন ভাত লইয়া খাইতে বসিব, ঐ সময়ে এক জন লোক আসিয়া অতিথি হইল। সে লোকটি জাতিতে নমোশূদ্র, সে পাক করিয়া খাইতে চাহিল না, এবং অন্যান্য সামগ্রী কিছু খাইতেও স্বীকার করিল না। সে বলিল, চাট্টি ভাত পাইলে খাই। আমি যে তাহাকে পাক করিয়া দিব, সে সময়ও নাই। আর কি করিব, আমার ঐ সে মুখের ভাত গুলি ছিল, সেই ভাত গুলি ঐ অতিথিকে ধরিয়া দিলাম। আমি ভাবিলাম, রাত্রিতে পাক করিলে খাওয়া যাইবেক। পরে

বৈকালে যে সকল কাজ করিতে হয়, তাহা এক মত সারিয়া ছেলেদিগকে ঘুম পাড়াইয়া পাক করিতে চলিলাম। কিন্তু ঐ সময় আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল। আমি ঘরের মধ্যে একা আর অন্য লোক নাই। ঘরে খাবার দ্রব্য নানা প্রকার আছে। তাহা আমি খেলেও খেতে পারি, কে বারণ করে। বরং আমাকে খাইতে দেখিলে ঘরের লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু আমি ভাত ছাড়া অন্য জিনিস আপনি লইয়া কখন খাইতাম না। এই জন্য আমার অনেক খাদ্য খাওয়ার বাদ হইয়া গিয়াছিল। আর আমি বিবেচনা করিলাম, আজ আমার খাওয়া হয় নাই শুনিলে, সকলে গোল করিবে। বিশেষতঃ খায়ে খেতে বসিলে ছেলে পিলে আসিয়া ভারি গোলযোগ করিবে, তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হইবে, এবং কাজের অনেক হানি হইবে। আর সে লেঠা করিয়া কাজ নাই, এই ভাবিয়া পাক করিতে চলিলাম। তখন পাক করিয়া অনেক রাত্রি বসিয়া থাকিলাম। বাহির বাটীর কাচারী আর ভাঙ্গে না, কর্ত্তাও বাটীর মধ্যে আইসেন না। তখন আমি অন্যান্য সকল লোককে ভাত দিয়া এক প্রকার কাজ মিটাইয়া কর্ত্তার ভাত লইয়া বসিয়া থাকিলাম। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কর্ত্তা এতক্ষণ পর্য্যন্ত আইলেন না, ইহার পরে ছেলেরা জাগিয়া উঠিবে। তাহা হইলে আমার আজি আর খাওয়া হইবেক না। এই ভাবিতে ভাবিতে সেই ভাবনাটি সিদ্ধ হইল। কর্ত্তাও বাটীর মধ্যে আইলেন, ছেলে একটি জাগিয়া কাঁদিতে

আরম্ভ করিল। আমি কর্ত্তার সম্মুখে ভাত দিয়া ঐ ছেলেটিকে আনিলাম। মনে করিলাম, কর্ত্তার খাওয়া হইতে হইতে ছেলেটির ঘুম আসিবে। না হয় কোলে লইয়াই খাওয়া যাইবেক। তাঁহার খাওয়া হইতে না হইতেই আর একটি ছেলে উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন মনে করিলাম, এ দুজনাকে লইয়াই খাওয়া যাইবে, এই বলিয়া সে ছেলেটিও আনিলাম। আমি ঐ দুই ছেলে লইয়াই ভাত খাইতে বসিলাম। ইতিমধ্যে দৈবাৎ ঝড় বৃষ্টি হইয়া আইল। তখন ঐ ঘরের দীপটাও নিভিয়া গেল। তখন অন্ধকার দেখিয়া ঐ দুই ছেলে কাঁদিতে লাগিল। আমার এত ক্ষুধা হইয়াছিল, যে আমি যদি ঐ ঘরে একা থাকিতাম, তাহা হইলে ঐ অন্ধকারেই ভাত খাইতাম। যে সকল চাকরাণী আছে, তাহারা বাহিরের লোক। রাত্রিকালে ছেলে দুটিকেও কিছু অন্ধকারে বাহিরে রাখা হয় না। বিশেষ ছেলে দুটি কাঁদিলে কর্ত্তাটি, কাঁদে কেন কাঁদে কেন, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সোর করিবেন। তদপেক্ষা আমার না খাওয়াই ভাল। তখন কাজে কাজেই ঐ ভাত ঐখানে রাখিয়া অন্য ঘরে যাইতে হইল। পরে ঝড় বৃষ্টি, কম হইলে ঐ ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, আমারও অতিশয় আলস্য হইল, সুতরাং সে দিবস আর খাওয়া হইল না। পর দিবস ঐ নিয়মে সকল কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া পাক করিতে চলিলাম। আমার যে কল্য খাওয়া মোটেই হয় নাই তাহা কেহ জানে না। আমি সকল লোকের খাওয়া হইয়া গেলে পর খাইব

ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু কোলের ছেলেটিকে একটি লোকে রাখিয়াছে। তখন তাহাকেও খাইতে দিতে হয়, ছেলেটিকেও দুধ খাওয়াইতে হয়, সুতরাং ঐ লোকটিকে ভাত দিয়া ছেলে কোলে লইয়া আমি ভাত খাইতে বসিলাম। বসা মাত্রেই ছেলেটি কোলের মধ্যে হাগিয়া দিল। তখন ঐ ছেলে কোলে থাকিয়া ঐ ভাতের উপর এত প্রস্রাব করিল যে, সমুদয় ভাত এককালে ভাসিয়া চলিল।

পরমেশ্বরের ঐ কাণ্ড দেখিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। আমি যে দুই দিবস ভাত খাই নাই, একথা আর কাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না, আমার মনে মনেই থাকিল। বিশেষতঃ আপনার খাওয়ার কথা সকল লোকে শুনিবে, সেটি ভারি লজ্জার বিষয়। ও সকল কথা আমি কাহার নিকট বলিতাম না ও কেহ জানিত না। এই প্রকারে মাঝে মাঝে কত দিবস আমার খাওয়া হইত না। পরমেশ্বরের কৃপায় আমার শরীরে রোগ-পীড়া বড় ছিল না। আমি যদি চিররোগা হইতাম, তাহা হইলে আমার এই কয়েকটি সন্তান প্রতিপালিত হওয়া কঠিন হইত। হে জগদীশ্বর! তোমার অসীম মহিমার কে সীমা নিরূপণ করিবে। এই অধিনী কন্যার প্রতি তোমার কত দয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ভাবিলে মন এককালে অধৈর্য্য ও অবশ হইয়া পড়ে। তোমার এ অজ্ঞান সন্তান তোমার মাহাত্ম্য কিছুই জানে না। তবে যে এ অধীনা কায়মনোবাক্যে তখন তোমাকে ডাকিত সে কেবল জননীর অনুমতি ক্রমে

মাত্র। এজন্য আমার জন্ম ধন্য, আমার জীবন ধন্য, আমি আপনাকে আপনি কৃতার্থ বোধ করি।

হে পিতা করুণাময়! আমি নিতান্ত হতভাগিনী, তোমাকে চিনি না। তুমি যদি আমার সঙ্গে না থাকিতে, আর আমার এই শরীর রোগাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, তবে আমার সন্তান পালন করা দূরে থাকুক, আমি আপনার শরীর লইয়া কি যে করিতাম বলিতে পারি না, আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসিতে হইত। অতএব তোমাকে শত শত ধন্যবাদ! হে দীননাথ! একটি সন্তান পালন করিতে মায়ের যে কত প্রকার যাতনা, আর কত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা তোমার প্রসাদে আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি। ছেলের জন্য মায়ের যে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। নিজের উপরে চাপ না পড়িলে লোকে বিশেষ মতে জানিতে পারে না। ফলতঃ সন্তানের জন্য মায়ের যে কত দূর পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেটি আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। মনুষ্য মাত্রেরই এ বিষয় ভালমতে জানা আবশ্যক। প্রায় লোকে এ সকল বিষয় জ্ঞাত নহেন। এমন যে স্নেহময়ী আমার মা, আমি তাঁহার সেবা করি নাই, এই কথাটি আমার মনে ভারি আক্ষেপের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জননী যে এমন দুর্ল্লভ বস্তু, আমি তাহা জানিয়াও জানিতে পারিলাম না। আমার জন্য আমার মার এত কষ্ট হইয়াছিল! আমি মায়ের কোন কর্ম্মেই লাগি নাই। আমা হইতে আমার মায়ের কিছু উপকারই হয় নাই। আমার

মা আমাকে দেখিবার জন্য কত রোদন করিতেন, এবং আমাকে লইয়া যাইবার জন্যই বা কত যত্ন করিতেন। আমি এখানে আসিয়া অবধি দায়মালী কারাগারে বন্দী হইয়াছি। এই সংসারের কাজ চলিবে না বলিয়া প্রাণান্তেও আমাকে পাঠান হইত না। তবে যদি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে আমার যাওয়া হইত, কিন্তু কয়েদী আসামীর মত দুই চারি দিন মধ্যে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইত। আমার সঙ্গে দশ পোনোর জন লোক, দুই জন সরদার, দুই জন দাসী, এক নৌকার সহিত বসিয়া থাকিত। আমি যে করারে যাইতাম, ঐ করার মতেই আসিতে হইত। ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন আমার যাওয়া কোনমতেই ঘটিত না। আমার মা মৃত্যুকালে আমাকে দেখিবার জন্য কত প্রকার খেদ করিয়াছিলেন। আহা! আমি এমন অধমা পাপীয়সী, মায়ের মৃত্যুকালেও তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়াছি। আমি মাকে দেখিবার জন্য কত প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টহেতু কোন ক্রমেই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এটি কি আমার সাধারণ আক্ষেপের বিষয়! হা বিধাতঃ! তুমি কেনই বা আমাকে মানবকুলে সৃষ্টি করিয়াছিলে। পৃথিবী মধ্যে পশু পক্ষ্যাদি যে কিছু ইতর প্রাণী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্য-জন্ম দুর্ল্লভ বটে। সেই দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়াও আমি এমন মহা পাতকিনী হইয়াছি। আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল। আমার জীবনে ধিক্! পৃথিবী মধ্যে মাতার তুল্য স্নেহময়ী আর কে আছে। মাতাকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি বলিলেও বলা যায়। এমন

যে দুর্লভ বস্তু মা, এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই। আহা! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গী।

ষষ্ঠ রচনা।

—o—

জন্মিয়া ভারত ভুমে, মজিয়া মোহের ঘুমে,
হেলায় হারাই চিরদিন।
না পাই উপায় তার, কোথা প্রভু বিশ্বাধার,
দয়া কর আমি হে সুদীন॥
তুমি প্রভু বিশ্বময়, তোমাতে প্রলয় লয়,
শুদ্ধ তত্ত্ব কে জানে তোমার।
কি করিব বরণন, পঞ্চমুখে পঞ্চানন,
অনন্ত না পান অন্ত যাঁর।
আগম নিগম যত, কোরাণ পুরাণ কত,
করে তব তত্ত্ব নিরূপণ।
কিন্তু কি জানিবে তারা, তোমার কৌশল ধারা,
শুদ্ধ তত্ত্ব জানে কোন জন॥
চরাচর ত্রিসংসারে, কে তোমা জানিতে পারে,
তুমি নাহি জানালে আপনি।
আমি কোন্ শক্তি ধরি, তোমাকে জানিতে পারি,
তাহে ছার অবলা রমণী॥
সত্তারূপে অহরহ, সর্ব্বস্থলে তুমি রহ,
এই মনে ভরসা আমার।
দিয়াছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
জানা যাবে মহিমা তোমার॥

তখন ঐ সংসার সমুদ্রে কাজে মগ্ন থাকাতে আমার দিবা-রাত্র কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে, তাহা আমি কিছু মাত্র জানিতে পারি নাই। অনন্তর আমার মনের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি একান্ত লেখা-পড়া শিখিয়া পুথি পড়িব। তখন আমি মনে মনে মনের উপর রাগ করিতে লাগিলাম। কি আশা হইল, কোন মেয়ে লেখা-পড়া শিখে না, আমি কেমন করিয়া লেখা-পড়া শিখিব, একি দায় উপস্থিত হইল। আমি কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। তখন আমাদিগের দেশের সকল আচার-ব্যবহারই বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টি ভারি মন্দ ছিল। সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনকার মেয়েছেলে গুলা নিতান্ত হতভাগা, প্রকৃত পশুর মধ্যে গণনা করিতে হই-বেক। এ বিষয় অন্যের প্রতি অনুযোগ করা নিরর্থক, আমাদের নিজের অদৃষ্ট ক্রমেই এ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারি বিরুদ্ধ কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধা ঠাকুরাণীরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, অতএব আমি কেমন করিয়া লেখা-পড়া শিখিব। আমার মনও তাহা মানে না, লেখা-পড়া শিখিব বলিয়া সতত ব্যাকুল থাকে। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যখন আমি ছেলে বেলা স্কুলে বসিয়া থাকিতাম, তখন যত ছাত্র লেখা-পড়া করিত, আমিতো তাহা শুনিতে শুনিতে কতক কতক মনে মনে শিখিয়াছিলাম, তাহার কিছুই কি আমার স্মরণ নাই? এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে ঐ চৌত্রিশ অক্ষর, ফলা বানান সহিত আমার মনে হইল। তাহাও

কেবল পড়িতে পারি, লিখিতে পারি না। কি করিব, ভাবিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ এক জন না শিখাইলে, কেহ লেখা-পড়া শিখিতে পারে না। বিশেষতঃ আমি মেয়ে, তাহাতে আবার বউ মানুষ, কাহার সঙ্গে কথা কহি না, অধিকন্তু আমাকে যদি কেহ দুটা কটু বাক্য বলে, তাহা হইলে আমি মৃত প্রায় হইব; এই ভয়ে আমি কাহার নিকটও কথা কহিতাম না। কেবল দিবারাত্র পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতাম, পরমেশ্বর! তুমি আমাকে লেখা-পড়া শিখাও, আমি নিতান্তই শিখিব। তুমি যদি না শিখাও, তবে আর কে শিখাইবে। এই রূপে মনে মনে সর্ব্বদা বলিতাম। এই প্রকারে কতক দিবস যায়।

এক দিবস আমি নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছি; আমি যেন চৈতন্যভাগবত পুস্তক খানি খুলিয়া পাঠ করিতেছি। আমি এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলাম। তখন আমার শরীর মন এককালে আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি জাগিয়াও চোক বুজিয়া বার বার ঐ স্বপ্নের কথা মনে করিতে লাগিলাম, আর আমার জ্ঞান হইতে লাগিল, আমি যেন কত অমূল্য রত্নই প্রাপ্ত হইলাম। এই প্রকার আহ্লাদে আমার শরীর মন পরিতুষ্ট হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কি আশ্চর্য্য! এ চৈতন্যভাগবত পুস্তক আমি কখন দেখি নাই, এবং আমি ইহা চিনিও না, তথাপি স্বপ্নাবেশে সেই পুস্তক আমি পাঠ করিলাম। আমি মোটে কিছুই লিখিতে পড়িতে জানি না, তাহাতে ইহা ভারী পুস্তক। এ পুস্তক যে আমি পড়িব, ইহা কোন মতেই

সম্ভব নহে। যাহা হউক, আমি যে স্বপ্নে এ পুস্তক পড়িলাম, ইহাতে আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমার জীবন সফল হইল। আমি পরমেশ্বরের নিকটে সমস্ত দিনই বলিয়া থাকি, আমাকে লেখা-পড়া শিখাও, পুঁথি পড়িব। সেই জন্য পরমেশ্বর লেখা-পড়া না শিখাইয়াই স্বপ্নে পুথি পড়িতে ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহা আমার বড় আহ্লাদের বিষয়, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার জন্ম ধন্য, পরমেশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। আমি এই প্রকার ভাবিয়া ভারী প্রফুল্ল-চিত্তে থাকিলাম।

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, শুনিয়াছি, এই বাটীতে অনেক পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে চৈতন্যভাগবত পুস্তকও থাকিলে থাকিতে পারে। কিন্তু থাকা না থাকা আমার পক্ষে সমান কথা। আমি কিছু লেখা-পড়া জানি না, সুতরাং পুথি চিনিতেও পারিব না, এই ভাবিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে দীননাথ! আমি কল্য স্বপ্নে যে পুস্তকখানি পড়িয়াছি, তুমি ঐ পুস্তকখানি আমাকে চিনাইয়া দাও। ঐ চৈতন্য-ভাগবত পুস্তক খানি আমাকে দিতেই হইবে, তুমি না দিলে আর কাহাকে বলিব। আমি এই প্রকার মনে মনে বলিতেছি, আর পরমেশ্বরকে ডাকিতেছি।

আহা কি আশ্চর্য্য! দয়াময়ের কি অপরূপ দয়ার প্রভাব! আমি যেমন মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছিলাম, অমনি তিনি শুনিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তখন আমার বড় ছেলেটি আট বৎসর বয়স্ক। আমি পাকের ঘরে পাক করিতেছি, ইতিমধ্যে কর্ত্তা আসিয়া ঐ ছেলেটিকে ডাকিয়া

বলিলেন, বিপিন! আমার চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি এখানে থাকিল, আমি যখন তোমাকে লইয়া যাইতে বলিব, তখন তুমি লইয়া যাইও। এই বলিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তক খানি ওখানে রাখিয়া, তিনি বাহির বাটীতে গেলেন।

আমি পাকের ঘরে থাকিয়া ঐ কথাটি শুনিলাম। তখন আমার মনে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল, তাহা বলা যায় না। আমি অতিশয় পুলকিত মনে তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলাম, সেই চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি বিদ্যমান। আমি ভারি সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, পরমেশ্বর! তুমি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছ। এই বলিয়া আমি ঐ পুস্তক খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বেশ করিয়া দেখিলাম। এখনকার পুস্তক সকল যে প্রকার, সে কালে এ প্রকার পুস্তক ছিল না। সে সকল পুস্তকে কাঠের আড়িয়া লাগান থাকিত। তাহাতে নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র ছবি আঁকাইয়া রাখিত। আমিতো লিখিতে পড়িতে জানি না, কিরূপে ঐ পুস্তক চিনিব? আমি কেবল ঐ চিত্র পুত্তলিকা দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিলাম।

পরে পুস্তকখানি ঘরের মধ্যে রাখিলে আমি ঐ পুস্তক খুলিয়া একটি পাত লুকাইয়া রাখিলাম। সে পাতটি কোথা রাখিব, কেহ দেখিবে বলিয়া ভারি ভয় হইল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এই পুস্তকের পাত যদি আমার হাতে কেহ দেখে, তাহা হইলে নিন্দার একশেষ হইবেক। অধিকন্তু কটুবাক্য বলিলেও বলার সম্ভব আছে। লোকের নিকট নিন্দিত কর্ম্ম করা, কিম্বা কটুবাক্য সহ্য করা বড় সাধ্য-

রণ ব্যাপার নহে। এ সকল বিষয়ে আমার ভারি আশঙ্কা। বিশেষতঃ সে সময়ে এখনকার মত আচার-ব্যবহার ছিল না। সে এক কাল গিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে পরাধীনতায় কাল যাপন হইত। বিশেষতঃ আমার অতিশয় ভয় ছিল। তখন ঐ পুস্তকের পাতটি লইয়া আমি ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করিব, কোথায় রাখিব, কোথায় থুইলে কে দেখিবে। এ প্রকার ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, যে স্থানে থাকিলে আমি সতত দেখিতে পাইব, অথচ অন্য কেহ না দেখে, এমন স্থানে রাখা উচিত। আর কোথা রাখিব, রান্না ঘরের হাঁসেলের মধ্যে খোড়ীর নীচে লুকাইয়া রাখিলাম। কি করিব, সকল দিবস সংসারের কাজে অবকাশ পাওয়া যায় না। সেই পাতাটি যে কখন দেখিব, তাহার সময় নাই। রাত্রে পাক সাক করাতেই ভারি রাত্রি হইয়া পড়ে। তখন ঐ সকল কাজ মিটিতে না মিটিতেই ছেলেপিলে গুলি জাগিয়া উঠিয়া বসে। তখন কি আর অন্য কোন কথা। তখন কেহ বলে মা মুতিব, কেহ বলে মা ক্ষিদে লেগেছে, কেহ বলে মা কোলে নে, কেহ বা জাগিয়া কান্না আরম্ভ করে। তখনতো ঐ সকলকে সান্ত্বনা করিতে হয়। ইহার পরে রাত্রিও অধিক হয়, নিদ্রা আসিয়া চাপে, তখন লেখা-পড়া করিবার আর সময় থাকে না। কি প্রকারে আমি শিখিব তাহার কোন উপায় দেখি না। লেখা-পড়া একজন না শিখাইলে কেহ শিখিতে পারে না। আমি যে দুই চারিটী অক্ষর মনে মনে পড়িতে পারি, তাহাও লিখিতে জানি না। লিখিতে না জানিলে, জিতাক্ষর হওয়া

দুঃসাধ্য। সুতরাং ঐ লেখা পাতটি আমি কেমন করিয়া পড়িব। আমি ভাবিয়া কোন উপায় দেখি না। অধিকন্তু কেহ দেখিবে বলিয়া সর্ব্বদাই ভয় হয়।

আমি এককালে নিরুপায় হইয়া, একান্ত মনে কেবল দিবারাত্র পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতাম, হে পরমেশ্বর! আমি এই পুস্তক যাহাতে পড়িতে পারি, আমাকে এরূপ কিঞ্চিৎ লিখিতে শিখাও, তুমি যদি না শিখাও, তবে আর কে শিখাইবে! আমি এই প্রকার পরমেশ্বরের নিকটে দিবারাত্র প্রার্থনা করিতাম। আর এক একবার মনে ভাবিতাম, লেখা-পড়া আমার শিখা হইবে না। যদিও চেষ্টা করিলে এবং কেহ শিখাইলে এক আদটি বিষয় শিখা যায়, তাহারও সময় পাওয়া যায় না। আমার কিছু হবে না, মিথ্যা বাসনা মাত্র। আবার মনে মনে বলি, কেন হবে না, পরমেশ্বর যখন আমার মনে এতখানি আশা দিয়াছেন, তখন তিনি কখনই নিরাশা করিবেন না। আমি এই প্রকার সাহস করিয়া ঐ পাতটি রাখিলাম। কিন্তু দেখিতে সময় পাই না। যখন পাক করি, ঐ সময়ে সেই পুস্তকের পাতটি বাঁ হাতের মধ্যে রাখি, আর এক একবার ঘোমটার মধ্যে লইয়া দেখি। দেখিলেই বা কি হইতে পারে, আমি মোটে কোন অক্ষর চিনিতে পারি না।

তখন আমার বড় ছেলেটি তালপাতে লিখিত। আমি তাহার একটি তালের পাতও লুকাইয়া রাখিলাম। ঐ তাল পাতটি একবার দেখি, আবার ঐ পুস্তকের পাতটিও দেখি, আর আমার মনের অক্ষরের সঙ্গে যোগ করিয়া দেখি,

আবার সকল লোকের কথার সঙ্গে যোগ করিয়া মিলাইয়া মিলাইয়া দেখি। এই প্রকার করিয়াই কতক দিবস গত হইল, সেই পুস্তকের পাতটি একবার বাহির করিয়া দেখিতাম, আবার কেহ দেখিবে বলিয়া অমনি খোড়ীর নীচে লুকাইয়া রাখিতাম।

আহা কি আক্ষেপের বিষয়! মেয়েছেলে বলিয়া কি এতই দুর্দ্দশা! চোরের মত যেন বন্দী হইয়াই থাকি, তাই বলিয়া কি বিদ্যা শিক্ষাতেও দোষ। সে যাহা হউক, এক্ষনকার মেয়েছেলে গুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখা-পড়া শিখায়। এই লেখা-পড়া শিখিবার জন্য আমাদের কত কষ্ট হইয়াছে। আমি যে যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছি, সে কেবল সম্পূর্ণ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মাত্র।

আমি যে লোকের অধিনী হইয়া একাল পর্য্যন্ত দিবস গত করিয়াছি, বাস্তবিক তিনি বেশ লোক ছিলেন। কিন্তু দেশাচার ত্যাগ করা ভারি কঠিন ব্যাপার। এ জন্যই আমার এ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। সে যাহা হউক, গত কর্ম্মের আর শোচনা কি? সে কালে মেয়ে ছেলের বিদ্যা-শিক্ষা ভারি মন্দ কর্ম্ম বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল। তখনকার কেন, এখনও কতক লোক এরূপ দেখা যায়, যেন বিদ্যা তাহাদিগের শত্রু। লেখা-পড়ার নাম শুনিয়া অমনি জ্বলিয়া উঠে। তাহাদের বলিলে কি হবে! সময় অমূল্য ধন; সে কাল, আর এই কাল, দুই সময়ের তুলনা

করিয়া দেখিলে, তদপেক্ষা এখন যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সকল বিষয় এখন যে প্রকার হইয়াছে, সে কালের লোক এখন দেখিলে তাহাদের আর বাঁচিতে হইত না। দুঃখে আর ঘৃণাতেই মরিত। বস্তুতঃ পরমেশ্বর যখন যেরূপ আচার-ব্যবহার নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন তাহা উত্তম বলিয়া বোধ হয়। সে কালের লোকের সেই মোটা মোটা কাপড়, ভারি ভারি গহনা, হাত পোরা শাঁকা, কপাল ভরা সিঁদুর বড় বেশ দেখাইত। আমাদের যদিও সে প্রকার সকল পরিচ্ছদ ছিল না, তথাপি যাহা ছিল তাহাই মনে হইল ঘৃণা বোধ হয়।

যাহা হউক, পরমেশ্বর আমাকে এত দিবস অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন, আমি বড় সন্তুষ্ট মনে এত কাল যাপন করিয়াছি। এখন আর অধিক বলিব কি, পরমেশ্বর যা করেন সেই ভাল। আমি যে ছেলে বেলা স্কুলে বসিয়া থাকিতাম, তাহাতে আমার অনেক উপকার হইয়াছে। আমি সেই পুস্তকের পাতটি ঐ তালের পাতটি লইয়া মনের অক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতাম। আমি এই প্রকার করিয়া সকল দিবস মনে মনে পড়িতাম। আমি অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে এবং অনেক কষ্ট করিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তক খানি গোঙ্গাইয়া পড়িতে শিখিলাম। সে কালে এমন ছাপার অক্ষর ছিল না। সে সকল হাতের লেখার অক্ষর পড়িতে ভারি কষ্ট হইত। আমার এত দুঃখের পড়া। বস্তুতঃ আমি এত কষ্ট করিয়া পড়িতে শিখিয়াও তাহা লিখিতে শিখিলাম না। বিশেষতঃ

লিখিতে বসিলে তাহার অনেক আয়োজন লাগে, কাগজ, কলম, কালি, দোয়াত চাহি। তাহা লইয়া ঘটা করিয়া সাজাইয়া বসিতে হয়। আমি একেতো মেয়ে; তাহাতে বউ মানুষ, মেয়ে মানুষকে লেখা-পড়া শিখিতেই নাই। এটি স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রধান দোষ বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সে স্থলে আমি এ প্রকার সাজিয়া লিখিতে বসিলে লোকে আমাকে দেখিয়া কি বলিবে। বাস্তবিক আমাকে কেহ কটুবাক্য বলিবে বলিয়া আমার অত্যন্ত ভয় ছিল। এই জন্য আমি লেখার বিষয় ক্ষান্ত দিয়া, গোপনে গোপনে কেবল পড়িতাম। আমি যে ঐ সকল পুস্তক পড়িতে পারিব, সে কথাটি আমার চিত্তের অগোচর। বিশেষতঃ এমন অবস্থায় লেখা পড়া হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। তবে যে যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছি, সে যেন পরমেশ্বর নিজে আমার হাত ধরিয়া শিখাইয়াছেন, এই মত আমার জ্ঞান হইত। আমি যে একটুক পড়িতে পারিতাম, তাহাতেই আমার মন মগ্ন হইয়া থাকিত, আর লেখার কথা মনেও করিতাম না।

সপ্তম রচনা ।

কোথা রৈলে দীননাথ ওহে দয়াময় ।
হের দুঃখিনীর দুঃখ হইয়া সদয় ॥
করুণাসাগর পিতা করুণানিধান ।
এ দুঃখ সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ ॥
বিষয় বিষেতে মোর জেরেছে হৃদয় ।
তোমারে ভুলিয়া আছি কি হবে উপায় ॥
অনাথ নিতান্ত আমি কে করে সান্ত্বনা ।
তোমা বিনা কে জানিবে মনের যন্ত্রণা ॥
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার ।
জানিতে পারি না কিসে হব ভব পার ॥
দেখিতেছি তব দয়া অসীম অতুল ।
ভরসা হতেছে তাই পাব বুঝি কুল ॥
কিন্তু হায় যখন ভাবিয়া দেখি চিতে ।
জানি না সরল মনে তোমারে ডাকিতে ॥
তখন হৃদয়ে হ'য়ে চিন্তাই প্রবল ।
আমারে করে হে নাথ নিতান্ত বিহ্বল ॥
অকুল সমুদ্র হেরি বিষাদিত মন ।
রক্ষা কর এ বিপদে বিপদভঞ্জন ॥

থাকিতে তুমি গো পিতা ডাকিব কাহারে ?
কাহারি বা সাধ্য আছে রক্ষা করিবারে ॥
দয়াময় নাম তব দয়ার সাগর।
তবে কেন দুঃখে এত হয়েছি কাতর ॥
বলবুদ্ধিহীন আমি না সরে বচন।
তরঙ্গে তরণী হয়ে দেহ দরশন ॥
সহে না সহে না নাথ বিলম্ব সহে না।
রাসসুন্দরীর দুঃখ হেরি প্রকাশ করুণা ॥

হে পিতঃ! রাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর! আমি এমন রাজার কন্যা হইয়া কেনই বা দুঃখিনী হইব। রাজার মেয়ে দুঃখিনী এ কথা কি সম্ভব হয়? কিন্তু পিতঃ! মাতা-পিতা নিকটে না থাকাতে মাতৃহীন সন্তান যেমন মনোদুঃখে থাকে, আমিও তোমার অদর্শনে অহরহঃ তেমনি দুঃখে ভাসিতেছি।

এই প্রকারে আমি চিন্তা করিয়া করিয়া পড়িতে শিখিয়াছি, তখন আমার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। এই পঁচিশ বৎসর আমার এই প্রকার অবস্থাতে গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমার পূর্ব্বের বাল্য অবস্থা সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আমার শরীর বাল্যভাব পরিবর্ত্তন করিয়া যৌবনবেশ ধারণ করিয়াছে, এবং মনও বাল্য অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া বিষয়কর্ম্মে আবিষ্ট হইয়াছে। আহা মরি! একি অপূর্ব্ব-কাণ্ড! আমার বাল্যচিহ্ন কিছুই নাই।

এই অবস্থায় কিছু দিন যায়, ইতিমধ্যে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যু হইলে ঘর একবারে

শূন্য হইল, ঘরে আমি একলা হইলাম। তখন ঐ সংসারের গৃহিণীর কর্ম্মের ভার আমার উপর পড়িল। আমিও ভারি বিপদে পড়িলাম। তখন আমার চারিটি সন্তান হইয়াছে, আবার ঐ সংসারের গৃহিণীর কর্ম্মের ভারটিও স্কন্ধে পড়িল। পূর্ব্বের অবস্থা আর কিছু থাকিল না, সে সময় সমুদয় নূতন হইল। আমার নূতন বৌ নামটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইল। কেহ বলিত মা, কেহ বলিত মা ঠাকুরাণী, কেহ বলিত বউ, কেহ বলিত বউ ঠাকুরাণী, কেহ বলিত বাবুর মা, কেহ বলিত কর্ত্তা মা, কেহ বলিত কর্ত্তা ঠাকুরাণী। এই প্রকার অনেক নূতন নূতন নাম হইল। আমার পূর্ব্বের বাল্যচিহ্ন আর কিছুই নাই। এককালে বাল্যভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া আমি একজন পুরাতন মানুষ হইলাম। পূর্ব্বে আমার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাব যে প্রকার ছিল, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমি যেন এখন সে আমি নই, আমি যেন ভিন্ন আর একজন হইয়াছি। আমার মনের দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া কত বল এবং কত সাহস প্রাপ্তি হইল। আমার পুত্র কন্যা, দাস দাসী, প্রজা লোক ইত্যাদি নানা প্রকার সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমি এখন আচ্ছা একজন গৃহস্থ হইয়াছি, এ আবার কি কাণ্ড! এখন অধিকাংশ লোকে আমাকে বলে কর্ত্তা ঠাকুরাণী। দেখা যাউক, আরও কি হয়।

আমার তিনটি ননদ ছিলেন, তখন তাঁহারা বিধবা হইয়া আমার নিকটেই আইলেন। তাঁহারা আমাকে যৎপরোনাস্তি

স্নেহ করিতেন, এবং অতিশয় যত্ন করিতেন। আমিও তাঁহা-দিগকে বিগ্রহতুল্য সেবা করিতাম, তাঁহারা সম্পর্কে আমার ছোট ননদ ছিলেন, তথাপি আমার এত ভয় ছিল, যে আমি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিকট সশঙ্কচিত্তে যোড়করে থাকিতাম; তাঁহারাও আমাকে প্রাণতুল্য স্নেহ করিতেন। বাস্তবিক ননদে যে ভাইজকে এত স্নেহ করে, এ প্রকার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমার চারি পাঁচটি সন্তান হইয়াছে, তথাপি এ পর্য্যন্ত আমি সেই ননদদিগের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতাম না। ঐ সংসারের গৃহিণীর সমুদয় কাজ আমার করিতে হইত, কিন্তু আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। তাঁহারা সকল বিষয়ে বেশ উত্তম লোক ছিলেন।

আমি বার বৎসরের সময় পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া এই শ্বশুর বাটীতে আসিয়াছি। আর আমার বয়ঃক্রম যখন পঁচিশ বৎসর, তখন আমার মনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ছেলেমি ভাবটি কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তখন তাহা বড় একটা প্রকাশ পাইত না। আমি যখন আট নয় বৎসরের ছিলাম, তখন আমাকে কত লোক পরিহাস করিয়া বলিত, তোমার মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমার বুদ্ধি এমনি ছিল, আমি সেই কথায় বিশ্বাস করিতাম। পরে যখন আমার ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম, তখনও সেই বুদ্ধির শিকড় কিছু কিছু ছিল, কিন্তু লোকে বড় প্রকাশ পাইত না, গুপ্তভাবে থাকিত।

ঐ বাটীতে একটী ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি।

এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া, বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্ত্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, দেখ দেখ! ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, একবার দেখ! আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম, ওটা কর্ত্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যে কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলাম। তখন সকলে বার বার বলিতে লাগিল, বাহিরে আসিয়া দেখ, ভয় কি? আমি ঘরের মধ্যে থাকিয়াই ভয়ে ভয়ে একটুক দেখিলাম।

ঐ বাটীর আঙ্গিনাতে রাশি রাশি ধান ঢালা থাকে। ঐ জয়হরি ঘোড়া প্রত্যহ আসিয়া ঐ ধান খাইত, পাছে ঐ ঘোড়া আমাকে দেখে, এই ভয়ে আমি যদি বাহিরে থাকিতাম, তবে তাহাকে দেখিবা মাত্র ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইতাম। এই প্রকারে কতক দিবস যায়, এক দিবস আমি পাকের ঘরে ছেলেদিগকে খাইতে দিয়া অন্য ঘরে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে ঐ জয়হরি ঘোড়া আসিয়া ধান খাইতে আরম্ভ করিল। তখন আমি ভারি মুস্কিলে পড়িলাম। ছেলেদিগকে খাইতে দিয়াছি, তাহারাও মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, কেহ বা কাঁদিতে লাগিল। ঘোড়াও ধান খাইতে লাগিল, যায় না। আমি ভারি বিপদে পড়িয়া আশুয়ান পাছুয়ান করিতে লাগিলাম। কি করি কর্ত্তার ঘোড়া, পাছে আমাকে দেখে, এই

ভাবিয়া ঐ খানেই থাকিলাম। ইতিমধ্যে আমার বড় ছেলেটি আসিয়া বলিল, মা, ও ঘোড়া কিছু বলিবে না ও আমাদের জয়হরি ঘোড়া, ভয় নাই। তখন আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম, ছি ছি আমি কি মানুষ! আমিতো ঘোড়া দেখিয়া ভয় করি না, আমি যে লজ্জা করিয়া পলাইয়া থাকি। এতো মানুষ নহে, এ যে ঘোড়া ও আমাকে দেখিলে ক্ষতি কি। এই সকল কথা যদি অন্য কেহ শুনিতে পায়, তবে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। বাস্তবিক আমি যে ঘোড়া দেখিয়া লজ্জা করিয়া পলাইতাম, তাহা কেহ বুঝিত না। সকলে জানিত, আমি ঘোড়া দেখিয়া ভয়ে পলাইতাম। এ কথা আমি লজ্জায় আর কাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু সেই দিবস হইতে আমি আর ঘোড়া দেখিয়া পলাইতাম না। সে কথা সকলে জানিলে, বোধ হয় আমাকে কত বিদ্রূপ করিয়া হাসিত। বাস্তবিক আমার অতিশয় ভয় ছিল। এখনকার ছেলে পিলেরা এত ভয় করা দূরে থাকুক, তাহা-দিগকে বুড়া মানুষে ভয় করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আমার নিজের বুদ্ধির দশা দেখিয়া মনে ধিক্কার জন্মে। আমার কর্ম্ম দেখিয়া অন্য লোকেতো হাসিতেই পারে, আপন কথা মনে হইলে আপনারি হাসি আইসে।

তখন পর্য্যন্তও আমি পূর্ব্বের মত বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া কাজ করিতাম, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, এখনও নূতন বউ হইয়া থাকিলে কোনমতে সংসারের কাজ চলিবে না। কাজের অনেক রকমে ক্ষতি হইবে। তখন ঐ সকল চাকরাণী-দিগের দুই একজনের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। আমার

ননদদিগের সঙ্গেও স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতাম। আমি ঐ সংসারের সমুদয় কাজ একা করিতাম, আর গোপনে গোপনে বসিয়া চৈতন্যভাগবত পুস্তকও পড়িতাম। তখন যে আমি পুস্তক পড়িতে পারি, তাহা অন্য কেহ জানিত না, কেবল ঐ চাকরাণী কয়েকজন জানিত। আর আমার নিকটে ঐ গ্রামের যে কয়েকজন লোক সতত থাকিত, তাহারাই জানিত। এই প্রকারে কয়েক দিবস গত হইল।

পরে ক্রমে ক্রমে আমার আর কয়েকটি সন্তান হইল, তখন ক্রমেই আমার গৃহিণীর পদটি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, যে অনেকে সংসারের সুখের জন্য পরমেশ্বরের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে। কিন্তু আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ঐশ্বর্য্যে আমার কোন আকিঞ্চন ছিল না। তত্রাপি জগদীশ্বর স্বয়ং অনুকূল হইয়া, সংসার ধর্ম্মে লোকের যাহা যাহা আবশ্যক লাগে, আমাকে তৎসমুদায়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পরমেশ্বর আমার কোন আক্ষেপ রাখেন নাই। পুত্র কন্যা, দাস দাসী, অনুগত প্রজা লোক, কুটুম্ব স্বজন, মান সম্ভ্রম, আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি সম্পদ লোকের যাহা ঘটিতে পারে, জগদীশ্বরের প্রসাদে আমার তাহা এক প্রকার বড় মন্দ ছিল না।

লোকে বলিয়া থাকে, অনেক সন্তান হইলে তাহার মাতার নানা প্রকার যন্ত্রণা হয়, সে কথাটি মিথ্যা নহে, যথার্থই বটে। তাহার কারণ এই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে লোকের সকল সন্তান একমত হয় না। কেহ বা মূর্খ, কেহ বা দুশ্চরিত্র, কেহ বা কুরূপ কুৎসিত কেহ বা নির্ব্বোধ হয় আর কেহ বা

পৈতৃক ধনে জলাঞ্জলি দিয়া অসার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল কর্ম্ম দেখিলে লোকে সহজেই নিন্দা করে। বাস্তবিক তাহা শুনিলে পিতামাতার মনে ভারী ক... উপস্থিত হয়। এমন কি আপনার জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়া থাকে। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার অকৃত্রিম স্নেহ, সুতরাং সন্তানের প্রতি যদি কেহ কুৎসিত ব্যবহার করে, কিম্বা তাহার কুৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহা শুনিলে তাঁহাদের মনে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ সন্তান হইতে মাতাপিতার যেমন নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, মনুষ্যকে এত যন্ত্রণা আর কিছুতেই ভোগ করিতে হয় না। সন্তান কুসন্তান হইলে তাহার জীবিত অবস্থাতেই যন্ত্রণা, আবার মরিয়া গেলেও যন্ত্রণা। বস্তুতঃ পিতার অপেক্ষা এ বিষয়ে মাতার যন্ত্রণাই বেশী। কিন্তু জগদীশ্বর সদয় হইয়া এ বিষয়ে আমাকে কোন কষ্টই দেন নাই। আমার পুত্রকন্যায় যে কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল, তাহারা সকলেই একমত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই সুন্দর, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, দাতা, দয়াবান, ধার্ম্মিক, এবং কখন গর্হিত কর্ম্ম করিত না। ইহাদের চরিত্র বিষয়ে আমাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু দর্প করিয়া বলা উচিত নহে, দর্পহারী ভগবান আছেন, সকলি করিতে পারেন। কখন কার অদৃষ্টে কি ঘটিয়া উঠে, তাহা বলা যায় না।

অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্॥

অষ্টম রচনা।

তুমি জীবনের কান্ত, তুমি আদি তুমি অন্ত,
অন্তরাত্মা জানহ সকল।
মনে যদি থাকে ছল, হাতে হাতে দাও ফল,
ফলদাতা তুমি হে কেবল॥
কে আর আছে এমন, তোমা বিনা অন্য জন,
কে জানিবে মনের বেদনা।
বিশেষ বলিব কত, জানিতেছ তুমি নাথ,
করিও না এতে প্রবঞ্চনা॥

হে নাথ পতিতপাবন! হে দয়াময় দীনবন্ধু! তুমিতো আমার মনেই আছ। আমার মনের মধ্যে যখন যে প্রকার ভাব উপস্থিত হয়, তোমার অগোচরতো কিছুই নাই। তাহা সকলি তুমি জানিতেছ।

জগতজীবন তুমি জগতের সার।
দোঁহাই দোঁহাই প্রভু দোঁহাই তোমার॥

আমি যদি আপনার নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া, কিছু গোপনে রাখিয়া থাকি, তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া দাও। আমার যে কথা স্মরণ না থাকে, তাহা তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও। আমি যে প্রবঞ্চনা করিয়া কোন কর্ম্ম করিব, কিম্বা কথা বলিব, এমন চেষ্টা আমার কখনই নাই। তবে যদি

কোন কারণে মনের ভ্রম ক্রমে হয়, তাহা তুমি ভাল করিয়া দাও; আমার মন যেন কখন তোমার নিয়মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম না করে। হে পিতঃ পরমেশ্বর! আমার মনের ভাবটি যখন যেমন হইয়া উঠে, তাহা সকলি তুমি জানিতেছ, অধিক আর কি বলিব!

লিখিতে জানি না আমি গর্দ্দভের প্রায়।
যে কিঞ্চিৎ লিখি নাথ তোমারি কৃপায়॥
যাহা কিছু মুখে বলি যা ভাবি অন্তরে।
সকলি তোমারে প্রভু পাইবার তরে॥

আমার যেমন দশ বারটি সন্তান হইয়াছিল, তেমনি যদি উহাদিগের চরিত্র মন্দ হইত, এবং সকলে মন্দ বলিত, তাহা হইলে আমার ভারী কষ্ট ভোগ করিতে হইত। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার সে সকল কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, বরং লোকের মুখে উহাদিগের প্রশংসা শুনিয়া এবং সভ্য ব্যবহার দেখিয়া, মন আরও প্রফুল্লই হয়। যাহা হউক, আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব, যখন যে প্রকার হইয়াছিল, তাহা সমুদয় আমি ব্যক্ত করিয়া বলিব। লোকে বলে সংসার সমুদ্র। সে সমুদ্রই বটে, কিন্তু সংসারের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করিয়া দেখিলে, সংসার তরঙ্গ হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ বোধ হয় বড় জয়ী হইতে পারে না, সময়ে সময়ে তুল্যই হয়। সে যাহা হউক, সেই সমুদ্র-লহরী মধ্যে পরমেশ্বর আমাকে সচ্ছন্দচিত্তে মহাসুখে রাখিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে আমার যদিও অত্যন্ত বিপদ্ ঘটিয়াছিল, তথাপি আমার মনের এত প্রফুল্ল ভাব ছিল যে, ঐ সকল মহাবিপদে আমাকে

এককালে অবসন্ন করিতে পারে নাই। সে সামান্য বিপদ নহে, যাহার নাম পুত্র-শোক। সেই শোক-সিন্ধু মধ্যে যেন একবার তরঙ্গে পড়িয়া, পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিতেছি, এই প্রকার আমার মনের ভাব ছিল। আমার মন সর্ব্বদা প্রায় আনন্দেই পরিপূর্ণ থাকিত। এই ২৮ বৎসর আমার শরীরের অবস্থা, এবং মনের ভাব, প্রায় একমতই চলিয়াছে। পরে ক্রমে আমার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর হইলে, আমার বড় ছেলে বিপিনের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনা হইল। সে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বলা যায় না, আনন্দরসে শরীর একবারে ঢল ঢল হইল। আমি আবার পুত্রবধূর শাশুড়ী হইলাম। আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। ঐ সময় আমি প্রাচীন দলে পড়িলাম। আমি ঐ ৪০ বৎসরের বার বৎসর পিত্রালয়ে ছিলাম। পরে পরাধীনা হইয়া ২৮ বৎসর এক প্রকার বউ হইয়াই ছিলাম। এই অবস্থায় আমার ৪০ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। এত দিবস আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব এক প্রকার ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার মনের প্রাচীনতা-ভাব উদয় হইতে লাগিল। তখন আমার শরীরের অবস্থা, মনের ভাব যে প্রকার ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। যেন সে শরীর সে মনই নয়। আমি মনোমধ্যে ভাবিতে লাগিলাম, আহা! পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! যদিও তখন এককালে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হই নাই, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা শরীরের ও মনের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। আমি এই সমুদয় শরীরের ও মনের ভাব ভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিতে

লাগিলাম। আমার এই মন কি প্রকারে এত গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিল। আমার মন সর্ব্বদা ভয়ে কম্পিত হইত, সে ভয় আমার মনে কে দিয়াছিল, আবার কাহার বল অবলম্বন করিয়াই বা সে প্রবল ভয় পরাস্ত হইল? আর আমি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বে রাত্রে আমি একা ঘরের বাহির হইতে পারিতাম না, দুই জন লোক আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। তথাপি আমার মনের ভয় যাইত না। এখনও সেই আমি আছি, এবং আমার মনও সেই মন আছে? তবে কেমন করিয়া এত সাহস, এত বল প্রাপ্ত হইলাম? আমি ইহার মর্ম্ম কিছুই জানিতে পারিলাম না। হায়! একি আশ্চর্য্য! এ অভয় দান আমার মনকে কে দিয়াছে। এখন বোধ হয়, রবিসুত-দর্শনেও আমার মন ভয় প্রাপ্ত হয় না, এ সমুদায় কাজ কাহার? আর আমি মনের মধ্যে যখন যাহা বাসনা করি, তাহা আমি কাহার নিকট বলি না, অন্য লোক কেহ সে কথা জানেও না। তথাপি আমার মনের সে বাঞ্ছাটি অনায়াসে পূর্ণ হয়, সেই কর্ম্ম বা আমার কে করে? আর একটি অপরূপ কাণ্ড দেখিতেছি, আমি একা ছিলাম, ইতিমধ্যে আমার ঘর বাড়ী, সংসার, পুত্র কন্যা, দাস দাসী, রাজ্য সম্পদ প্রভৃতি নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আইল, এখন সকল লোক আমাকে বলে কর্ত্তাঠাকুরাণী। এ কর্ত্তাগিরি পদে কে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে? আর কাহার অনুরোধেই বা আমি এ কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। আহা মরি মরি! কি অদ্ভুত কাণ্ড! এই সকল কৌশলের বালাই লইয়া মরি। এই সকল কর্ম্মের

মূল যিনি তাঁহাকে কি বলিব, সেই কর্ম্মকারকে শত শত ধন্যবাদ দেই। আহা! করুণাসাগর পিতা কোথা গো! তোমার এ অনাথা কন্যাটিকে একবার দর্শন দিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। জীবন সার্থক হউক।

আমি সংসারে কেন বদ্ধ হইয়াছি। এমন মনোমোহিনী শক্তি দিয়া কে আমার মনকে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। না আমার মন আপনি বিষয়ের ঐশ্বর্য্য-লোভে ভুলিয়া রহিয়াছে। আবার বলি না, তাহা কেন হবে, এ যে অন্যায় বলা হইতেছে, একজন কেহ না দিলে মন পাবে কোথা। যিনি দয়া করিয়া আমাদের সকল দিয়াছেন, তিনি এই সংসারে আমাদিগকে মোহে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমার মনের মধ্যে এই প্রকার সকল তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। এই প্রকার মনে হওয়াতে আমার মন ভারী ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আমার মন তখন পুরাণ, কীর্ত্তন শ্রবণাদির প্রতি ভারী ব্যগ্র হইল। তখনকার সেই এককাল ছিল; সে কালে মেয়েছেলেদিগের স্বাধীনতা মোটেই ছিল না; নিজের ক্ষমতায় কোন কর্ম্মই করিতে পারা যাইত না, সম্পূর্ণ রূপে পরাধীনা হইয়া কালযাপন করিতে হইত। সে যেন এককালে পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গীর মত থাকা হইত। তন্মধ্যে আমার মনে আবার কি প্রকার ভাব উদয় হইল, তাহাও কিঞ্চিৎ বলিতে হইল।

মনের যে ভাব দেখি আশ্চর্য্য কেমন।
চাঁদ ধরিবারে ধায় হইয়া বামন॥

আমার মন যেন তখন ষড়্ভুজ হইল। দুই হাতে ঐ সংসারের সমুদায় কাজ করিতে চাহে; যেন বাল বৃদ্ধ কেহ কোন মতে অসন্তুষ্ট না হন। আর দুই হাতে ঐ কয়েকটি ছেলে সাপটিয়া বুকের মধ্যে রাখিতে চাহে। অন্য দুই হস্তে আমার মন যেন চাঁদ ধরিতে চাহে। আহা কি আশ্চর্য্য! মনের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার মুখে আর বাক্য সরে না। দেখ! লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্র রহিয়াছে; সেই চন্দ্র কি কখন কেহ হস্তে ধারণ করিতে পারিয়াছে, কখনই নহে। কেবল নিরর্থক বাসনা মাত্রই সার। যেমন ছেলেপিলে চন্দ্র দেখিয়া ধরিতে চাহে; এবং ঐ চন্দ্র পাড়িয়া দাও বলিয়া ক্রন্দন করে, তখন "আয় আয় চাঁদ, আমার চাঁদের কপালে টি দিয়ে যা" এই বলিয়া, ছেলেপিলেকে ভুলাইয়া রাখা হইয়া থাকে। আমার মনকেও তখন সেই প্রকার ছেলে ভুলানর মত প্রবোধ দিতে হইল। আমার মন, তখন সংকীর্ত্তন ও পুরাণাদি শ্রবণের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইল; তাহা কোথা শুনিব। আমাদের বাটীতে পুরাণ সংকীর্ত্তন আদি যাহা কিছু হয়, তাহা বাহির আঙ্গিনাতেই হয়, তাহা বাটীর মধ্যে হইতে শুনা যায় না। বাহিরের আঙ্গিনা অনেকখানি তফাত. আমিও বাটীর মধ্য হইতে আঙ্গিনার বাহির যাই না, কি প্রকারে শুনিব। আমার মন তাহা কোন মতেই মানে না. মন নিতান্তই বলে আমি পুরাণ শুনিব।

আমি পুস্তক যে একটু একটু পড়িতে পারি, তাহাও পড়িবার সময় পাই না। বিশেষ কেহ দেখিয়া কি বলিবে, এই ভয় অতিশয় হয়। মনও কোন মতে বুঝে না, ভাবিয়াও

উপায় দেখি না। কি করিব, মনে মনে এক উপায় স্থির করিলাম। আমার ননদ তিনটি আছেন, তাঁহারা যদি আমাকে পুথী পড়িতে দেখেন, তবে আর রক্ষাও নাই। তাঁহাদিগের যে সময়ে আহ্নিক পূজা আহারাদি হয়, ঐ সময় আমি পুথী পড়িব। এই বলিয়া আমার মনকে স্থির করিলাম। পরে আমার নিকট যে সকল প্রতিবাসিনী সতত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিতাম। আমি যতক্ষণ ঐ পুস্তকখানি পড়িতাম, কেহ আসিয়া দেখিবে বলিয়া সেই পথে একজন লোকপ্রহরী রাখা হইত। আমি অতি ছোট ছোট করিয়া পুথী পড়িতাম, তত্রাপি আমার প্রাণ ভয়ে এক একবার চমকে চমকে উঠিত, মনে ভাবিতাম কেহ বুঝি শুনিল। বাস্তবিক ভয়টি আমার প্রধান শত্রু ছিল। সকল বিষয়েই বড় ভয় হইত, আমি ভয়েই মরিতাম। কিন্তু যাঁহারা আমার সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহারা উত্তম লোক ছিলেন। তাঁহাদিগের সহায়ে আমি গোপনে গোপনে যানও করিতাম। এই প্রকার করিয়া অনেক দিবস গত হইয়াছে। বাস্তবিক সে কালের লোক এখন পর্য্যন্ত যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের নিকট মেয়েছেলের বিদ্যা শিক্ষা ভারী মন্দ কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিয়া কি টাকা রোজগার করিয়া আনিবে? এখনকার মেয়েগুলা লেখাপড়া শিখিব বলিয়া পাগোল হয়। মেয়েছেলে ঘরের মধ্যে কাজ কর্ম্ম করিবে, রান্না বান্না করিবে, লজ্জা সরম করিবে, আমরা ইহাই জানি।

আমাদের কালে, আর এত বালাই ছিল না। শুনিতে পাই, বলে লেখা-পড়া শিখিলেই ভাল হয়। আমরা যে লেখা পড়া জানি না, তবে আর আমরা মানুষ নই। আমাদের আর দিন গেল না। তাঁহারা এই প্রকার বলিয়া থাকেন। সে সকল লোকের মনের ভাবে বুঝা যায়, যেন বিদ্যার আর কোন গুণ নাই, বিদ্যায় কেবল টাকা উপার্জ্জন হয়। ঐ সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইত, কিন্তু পুথী পড়া আমি ছাড়িতাম না, গোপনে গোপনে বসিয়া পড়িতাম। এই মতেই কতক দিবস যায়।

পরে ঐ তিনটি ননদের সঙ্গে আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম, তাহাতে তাঁহারা ভারী সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বেশ মিল হইল। তখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, আমি পুথী পড়িতে পারি। তাহা শুনিয়া ভারী আহ্লাদিত হইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, আহা! তুমি লেখাপড়া জান, ইহা আমরা এত দিবস কিছুই জানি না। এই বলিয়া তাঁহারা দুই ভগিনীতে আমার নিকটে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমার সেই দুটি ননদ অল্প দিন লেখাপড়া করিয়াই ক্ষান্ত দিলেন, শিখিতে পারিলেন না। তখন ঐ পুস্তক পড়ার জন্য আমার সেই ননদেরা আমাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। সেই অবধি আমি আর গোপনে পুথী পড়িতাম না। আমার ননদদিগের সম্মুখে সদর হইয়া পুথী পড়িতে লাগিলাম। তখন আমার মনে আনন্দের আর সীমা থাকিল না। আহা কি আহ্লাদের বিষয়! আমার বহু দিবসের বাঞ্ছা জগদীশ্বর পূর্ণ

করিলেন ; এবং প্রতিবাসিনী মনসুটীদের সঙ্গে কখন কখন গোপনে গোপনে গানও করিতাম। সংসারের কাজ আমার নিকট তৃণবৎ বোধ হইত। আমি মনের আনন্দেই প্রায় সকল দিবস থাকিতাম। এই সকল আহ্লাদে আমার মন সততই মগ্ন থাকিত। বিষয়ের দুঃখের ধার বড় ধারিতাম না। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় প্রেমানন্দেই পরিতুষ্ট ছিলাম।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সংসারের বিষয়ে অনেক লোকেরি প্রায় দুঃখের ভার বহন করিতে হয়, কিন্তু আমার যদিও কোন বিষয়ে কষ্ট ছিল না, তথাপি অনেক যন্ত্রণা আমার অন্তরে বাহিরে বিলক্ষণ লাগিয়া রহিয়াছিল। হে জগদীশ্বর! এমন যে দুঃসহ যন্ত্রণা পুত্রশোক ইহা যেন আর মনুষ্যের হয় না। আমার দশটি পুত্র, দুটি কন্যা, এই বারটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার মধ্যে যে কয়েকটি সন্তানের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা আমি বিশেষ করিয়া বলি। মধ্যম পুত্র পুলিনবিহারীর অন্নপ্রাশনের সময় মৃত্যু হয়। পরে প্যারীলাল নামক আর একটি পুত্র একুশ বৎসরের হইয়াছিল। সে ছেলেটি বহরমপুর কলেজে পড়িত। সেই বহরমপুর জেলাতেই তাহার মৃত্যু হয়। রাধানাথ নামে একটি পুত্র ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। আর একটি পুত্রের তিন বৎসরের সময়েই মৃত্যু হয়, তাহার নাম চন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ পুত্রটির ৪ বৎসরের সময়ে মৃত্যু হয়, তাহার নাম মুকুন্দলাল। আমার বড় কন্যাটির ২৭ বৎসর বয়সে একটি পুত্রসন্তান জন্মে, ১৩ দিবস পরে সুতিকা ঘরেই তাহার মৃত্যু হয়। ঐ সুতিকা ঘরেই তাহার ছেলেটিরও মৃত্যু হয়। আমার

একটি পুত্র গর্ভবাসে ছমাস থাকিয়া গত হইয়াছে। আমার বড় পুত্র বিপিনবিহারীর দুটি পুত্রসন্তান হয়, তিন বৎসর এবং ৪ বৎসরের হইয়া সে দুটি সন্তানই মরিয়াছে।

আমি যদি এই সকলের মৃত্যুর কথা একবার মনে করিয়া দেখি তাহা হইলে আমার শোক বড় অল্প হয় না, শোক-সাগর উথলিয়া উঠে। আমার পৌত্র, দৌহিত্র, এবং ছয়টি পুত্র, আর একটি কন্যা, এই সমুদয় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট এখন আমার চারিটি পুত্র, আর একটি কন্যা, এই মাত্র। পরে যে কি হইবে, তাহা পরমেশ্বরই জানেন। সংসারী লোকের প্রতি পরমেশ্বর সম্পদ বিপদ্ দুটি সমান করিয়া দিয়াছেন। কেহ বা কষ্টের কথাটি আগ্রহ করিয়া মনে রাখিয়া সতত কষ্ট ভোগ করিতেছে। কোন লোক এমনও দেখা যায়, তাঁহাদিগের শত শত বিপদের রাশি সম্মুখে থাকিলেও তাঁহারা সে দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না।

সে যাহা হউক লোকে বলে অস্ত্রের প্রহার আর পুত্রশোক এ দুইটিই সমান কথা। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অস্ত্রের প্রহার ও পুত্রশোক কখন সমান হইতে পারে না। অস্ত্রাঘাত মনুষ্যের শরীরে যদি অধিক পরিমাণে হয়, তাহা হইলে অহার মৃত্যু হইতে পারে। আর যদি কিছু অল্প পরিমাণে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত শরীরে অস্ত্রের ঘা থাকে, সেই পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়। ঐ ঘা যখন শুকাইয়া যায়, তখন আর শরীরে জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই থাকে না। কিন্তু শোকাঘাত যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত থাকে। যদিও অনেক কষ্টে বাহিরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া

অন্যমনাঃ হইয়া থাকা যায়, তাহা হইলেও শোকানল প্রবল বেগে অহরহঃ হৃদয় দগ্ধ করে। শোকে লোকের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। শোকে লোক জ্ঞানহারা হইয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়া যায়। শোকে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, আর কত প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা বলা যায় না। শোক হইলে লোক মৃত্যু ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু মৃত্যু হয় না, মৃত্যুর অধিক ফল হয়।

নবম রচনা।

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু,   অনাথ জনের বন্ধু,
অখিলের বিপদভঞ্জন।
ডাকিতেছি প্রাণপণে,   শুনে কি শুন না কানে,
বধির হয়েছ কি কারণ॥
তোমার পালিত সৃষ্টি,   একবার কর দৃষ্টি,
আছি নাথ চাতকিনী প্রায়।
জানিয়া মনের কথা,   কেন কর কপটতা,
আর কত জানাব তোমায়॥
নির্দ্দয় দুর্জ্জন জনে,   স্মরণ করিলে শুনে,
তুমি নাথ দয়ার সাগর।
আমি নারী পরাধীনা,   তাতে পুনঃ শক্তিহীনা,
কৃপণতা আমারি উপর॥
এই চরাচরে কত,   আছে পাপী শত শত,
মুক্তিপদ পাইবে সকলি।
ছাড়ি এ অবলা জনে,   উদ্ধারিবে জগজনে,
দেখিব কেমন ঠাকুরালী॥
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,   পতিত জনের গতি,
নাম ধর পতিতপাবন।
রাসসুন্দরীর হাতে,   পারিবে না ছাড়াইতে,
দিতে হবে অভয়চরণ॥

পরমেশ্বরের কাণ্ড বুঝা ভার। তিনি যে কখন কি করিবেন তাহা তিনিই জানেন। আমি যে পর্য্যন্ত আপনার হাতে খাইতে শিখিয়াছি, (এ কথাটি আমার বেশ স্মরণ আছে) সে পর্য্যন্ত আমি কখন আপনার হাতে ভিন্ন অন্ত কাহার হাতে খাই নাই। অদ্য ১২৮০ সালের ২৭এ ভাদ্র অবধি এত কাল পরে সেই বাল্য অবস্থাটি ঘটিয়াছে। আমার পাক প্রস্তুত খাইতে বসিব, এমত সময়ে আমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিটিতে দৈবাৎ আঘাত লাগিয়া রক্তে প্রবাহিত হইল। তখন কাজে কাজেই আপনার হাতে খাওয়া হইল না, অন্য এক জনের সাহায্যে খাইতে হইল। বস্তুতঃ যখন আমাদের নিজের ইচ্ছা মতে আমরা আহারও করিতে পারি না, তখন পরমেশ্বর ভিন্ন আমাদের কোন কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। তবে কেন আমাদের মনে এত গৌরব! অতএব পরমেশ্বর ভিন্ন আর সকলি মিথ্যা। তবে লোকে কেন বলে আমার শরীর, আমার বাটী, আমার ঘর। ফলতঃ আমার আমার সকলই মিথ্যা; মনুষ্যের মনের ভ্রম আর যায় না।

একথা ক্ষান্ত থাকুক, এখন যাহা বলিতেছি তাহাই বলি। পুত্রশোক প্রবল যন্ত্রণা যদিও আমার অন্তরে দিবারাত্র ধক ধক করিয়া জ্বলিতেছে, তথাপি একেবারে পাতিত করিতে পারে নাই। আমার বুদ্ধির চালনা শক্তি না হইতেই আমার মা আমাকে মহামন্ত্র দয়াময় নামটি বলিয়া দিয়াছেন। সেই মহৌষধ আমার অস্থিভেদী হইয়া রহিয়াছে। আমার শরীর মন যখন বিষয়ের হলাহলে একেবারে আচ্ছন্ন ও অবশ